গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ২৯ এপ্রিল- ৫ মে, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

''... একদল মানুষ সমস্যার সামনে কুঁকড়ে যায়, আর একদল সমস্যাকে মোকাবিলা করতে পারে — তারা সমস্যাকে সঠিক রাস্তায়, বিপ্লবী রাস্তায় সচেতন মানুষের মত মোকাবিলা করে। এই রাস্তাটা কি ? না, সমস্যা যত আসবে, তা নিরসনের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তত ধারালো হবে, তত আমি মানুষকে ভালো বুঝতে শিখবো ; মানুষের কোথায় দুর্বলতা — তার উপলব্ধি ততই আমার গভীর হবে। ...আমরা, সচেতন বিপ্লবী কর্মীরা, সমস্যাকে ভয় পাই না। আমরা তো সমস্তরকম সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য সর্বদা তৈরি। শুধু তাকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করা, মানুষের মতো মোকাবিলা করাটাই হচ্ছে আমাদের কাছে সমস্যা। ... বিপ্লবী জীবন সংগ্রামের জীবন। এখানে জড়ত্ব নেই, নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন নেই। ... বিপ্লবী জীবনের মর্মবস্তু হচ্ছে সংগ্রাম ও সমস্যার মধ্যে আনন্দ পাওয়া — সমস্যাহীন জীবন হল বন্ধ্যা।''

— শিবদাস ঘোষ

(সর্বহারা বিপ্লবী দল ও কর্মীদের ভূমিকার কয়েকটি দিক)

মহান মে দিবস জিন্দাবাদ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস পালন করুন

জনগণনির্ভর বৃত্তি পরীক্ষা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে

পরাস্ত সরকার মুখ রক্ষার পথ খুঁজছে

দীর্ঘ প্রায় ২৮ বছর বাদে রাজ্যের ক্ষমতাসীন শাসক দলের চৈতন্যোদয় হয়েছে। শাসনকালের শুরুতে যে শিক্ষানীতি গ্রহণ করে তারা ৪র্থ শ্রেণীতে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা তুলে দিয়েছিল তারা সেই পরীক্ষা ফিরিয়ে আনছে। চলতি শিক্ষাবর্ষের একেবারে শেষ পর্যায়ে ১৯-২১ এপ্রিল এই পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। মুখে প্রচার চলছে — 'সরকার শিক্ষার উন্নতি চায় - তাই এই পরীক্ষার ব্যবস্থা', কিন্তু বাস্তব বলছে অন্য কথা। শিক্ষাবিদদের নেতৃত্বে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ কর্তৃক পরিচালিত ও এস ইউ সি আই কর্মীদের দ্বারা রূপায়িত বৃত্তি পরীক্ষার বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে সরকার পিছু হটেছে, যা দীর্ঘ আন্দোলনের আংশিক বিজয় সূচিত করছে। আংশিক, তার কারণ, সরকার পিছু হটলেও এখনও পাশ-ফেল প্রথা ও বৃত্তি চালু করেনি।

এতদিন শাসক দলের নেতারা সমর্থকদের বুঝিয়ে ছিলেন, ইংরেজি খারাপ, পাশ-ফেল প্রথা খারাপ, বৃত্তি পরীক্ষা খারাপ। এ'সব পরিত্যাজ্য। না হলে নাকি শিক্ষার চরম সর্বনাশ হবে। তাই এগুলির বিরুদ্ধে তাদের তোতাপাখির মত করে বুলি আওড়াতে শেখানো হয়েছিল। কিন্তু জনমতকে রোখা গেল না। ইংরেজি চালু হল — আগে ছিল ৩য় শ্রেণী থেকে, কিন্তু ফিরে এল একেবারে প্রথম শ্রেণী থেকে। তার উপর আবার ৪র্থ শ্রেণীর পরীক্ষা? এতদিন বোঝানো হচ্ছিল — দ্বিতীয় শ্রেণীর বহির্মূল্যায়নই একমাত্র ভাল জিনিস। কিন্তু তা মানিয়ে নেওয়া যাচ্ছিল না। ফলে বাধ্য হয়ে ৪র্থ শ্রেণীতে পরীক্ষা চালু করে দিতে হল। আন্দোলনের চাপে, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের বৃত্তি পরীক্ষার পক্ষে বিপুল জনসমর্থনের চাপেই তাদের দেখাতে হচ্ছে তারাও পরীক্ষা চায়।

তাও এবছর চালু করার কোন সদিচ্ছা ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে দিয়ে প্রস্তাব পেশ করে ধীরে সুস্থে আগামী বছর চালু করার একটা কৌশল নেওয়া হচ্ছিল। তাই এবার তৃতীয় পর্বের মূল্যায়ন করার সময়সীমা স্কুলগুলিতে জানান হল ৮ - ১৮ এপ্রিল। সব ছেলেমেয়েরা স্কুলের এই পরীক্ষায় নিজ নিজ স্কুলে বসবে। তারপরই আবার সরকারি টেস্টে বসতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা তো গিনিপিগ। তাদের নিয়ে যেমন খুশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতেই পারে। বিশেষ করে সরকারি দয়ায় যখন বিনাপয়সায় পড়ছে। তাদের উপর সব অধিকারই সরকারের বর্তায়।

কিন্তু সময়টা কেমন হল? স্কুলের পরীক্ষার জন্য ৮ - ১৮ এপ্রিল বলা হল কেন? কারণ তার আগে ৫ ও ৭ এপ্রিল দ্বিতীয় শ্রেণীর বহির্মূল্যায়ন। ১৮ এপ্রিলের পর ১৯ - ২১ এপ্রিল সরকারি টেস্ট, ২২, ২৪ এপ্রিল ছুটি। কবে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার খাতা দেখা হবে, কবে ফল বেরুবে — এসব দেখার বালাই নেই।

সাতের পাতায় দেখুন

ভিতরের পাতায়

- **ধনকুবের**
- **নির্বাচনে সুপারিশ**
- **ইরাকের অবস্থা**
- **মহার্ঘ ভাতা**
- **জেলায় জেলায় আন্দোলন**

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠাদিবসে শহীদ মিনারে বিশাল সমাবেশ (বিস্তারিত আগামী সংখ্যায়)

বীরভূমে রাজনৈতিক ক্লাস

এস ইউ সি আই-এর ৫৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে একটি রাজনৈতিক ক্লাস সিউড়ী নেতাজী বিদ্যাভবনে ১৬ ও ১৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ক্লাসের সূচনা হয়। মহান নেতার 'মার্ক্সবাদ ও মানব সমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে' বইটি বিভিন্ন সেল, লোকাল ও ইউনিটে যৌথ এবং ব্যক্তিগত পাঠের পর জেলা ক্লাসে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নকে সংযোজিত করে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রতিভা মুখার্জী।

ক্লাসে উপস্থিত কমরেডদের আবেগ, উৎসাহ ও প্রত্যয় ছিল লক্ষণীয়। কমরেড প্রতিভা মুখার্জী উপস্থিত কমরেডদের কাছে বইটির সারমর্ম সংক্ষেপে আলোচনা করেন এবং ২৪ এপ্রিলের সমাবেশকে ঐতিহাসিক সমাবেশে পরিণত করার জন্য কমরেডদের সর্বশক্তি নিয়োগের আহ্বান জানান। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি হয়।

রাইস মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন

১২ এপ্রিল বীরভূম রাইস মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন লোহাপুর রাইসমিলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শতাধিক শ্রমিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড ওলি আহাদ। তিনি ইউনিয়নের বিগত কাজকর্ম, আন্দোলন ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় প্রধান বক্তা ইউ টি ইউ সি-এল এসের বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড রফিকুল হাসান শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সমস্ত শ্রমিকদের অবিলম্বে পিএফ ও পে-স্লিপ চালু করার দাবি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

কমরেড ওলি আহাদকে সভাপতি ও কমরেড খাইরুল বাসারকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৪ জনের একটি ইউনিয়ন পরিচালন কমিটি গঠিত হয়।

চায়না ক্লে-ফায়ার ব্রিকস-পটারিজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন

১০ এপ্রিল মহম্মদবাজারের প্যাটেল নগর গার্লস হাইস্কুলে চায়না ক্লে-ফায়ার ব্রিকস-পটারিজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে তিন শতাধিক শ্রমিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কিছুদিন আগে চায়না ক্লে মাইন্‌সের তিন শতাধিক শ্রমিক সি আই টি ইউ'র আপসকামী মালিক ঘেঁষা নীতির প্রতিবাদে ইউ টি ইউ সি-এল এস অনুমোদিত ইউনিয়নে যোগদান করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই মহম্মদবাজার লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড কুদ্দুস আলি। সভায় প্রধান অতিথি ও বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউ টি ইউ সি-এল এস রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা কমরেড এ এল গুপ্তা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী।

কমরেড জয়নাল আবেদীনকে সম্পাদক ও কমরেড কুদ্দুস আলিকে সভাপতি নির্বাচিত করে ১৫ জনের ইউনিয়ন পরিচালন কমিটি গঠিত হয়।

রাজগ্রাম স্টোন কোম্পানি লেবার ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন

ভারতের বৃহত্তম স্টোন মাইন্‌স রাজগ্রাম স্টোন কোম্পানিতে ইউ টি ইউ সি — এল এস অনুমোদিত একমাত্র স্বীকৃত ইউনিয়ন রাজগ্রাম স্টোন কোম্পানি লেবার ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন ৮ ও ৯ এপ্রিল গোপালপুর কোয়ারিতে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কোয়ারির ফার্স্ট এড সেন্টারে বিভিন্ন বিভাগ থেকে নির্বাচিত শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ৮ এপ্রিল প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনেক প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। পরদিন ৯ এপ্রিল সকাল ৭টায় কোয়ারি মাঠে দুই সহস্রাধিক শ্রমিকের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সভাতেই প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর সর্বভারতীয় সহ-সভানেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কমরেড জিয়াদ আলি বক্সী ও কমরেড রফিকুল হাসান।

কমরেড জিয়াদ আলি বক্সীকে সভাপতি ও কমরেড রফিকুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ৩১ জনের নতুন ইউনিয়ন পরিচালন কমিটি গঠিত হয়।

নলহাটিতে যুক্ত শ্রমিক সম্মেলন

নলহাটি এলাকায় শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৪ এপ্রিল নলহাটি বাসস্ট্যান্ডে সিন্‌হা লজে এক যুক্ত শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সিটু, আই এন টি ইউ সি, টি ইউ সি সি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সংগঠনগুলি কার্যত মালিকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, যার ফলে নলহাটি এলাকাতে শ্রমিক আন্দোলন সমূলে বিনষ্ট হতে চলেছে। এই অবস্থায় স্থানীয় এলাকায় শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অধীনস্থ বীরভূম মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, বীরভূম রিক্সা ও ভ্যান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, বীরভূম মুটিয়া মজদুর ইউনিয়নের নলহাটি শাখা, হকার সংগ্রাম কমিটি এবং নলহাটি পুরসভা সুইপার্স ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে তিন শতাধিক শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে সিরাজুল ইসলামের প্রস্তাবনায় 'নলহাটি শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি' গড়ে তোলা হয়। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন মাসেদুল ইসলাম। যুক্ত শ্রমিক সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে কমরেড আব্দুস সালামকে আহ্বায়ক নির্বাচিত করে ১৩ সদস্যের 'নলহাটি শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়।

শ্রমিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুজিত ভট্টশালী, এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড রফিকুল হাসান ও এস ইউ সি আই নলহাটি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড আব্দুস সালাম। সভাপতিত্ব করেন কমরেড জহরলাল ঘোষাল। বক্তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এবং মালিকশ্রেণীর শ্রমিকবিরোধী নীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে জলঙ্গীতে মেডিক্যাল ক্যাম্প

গত ১৬ এবং ১৭ এপ্রিল জলঙ্গীর ভাঙন দুর্গত এলাকায় এক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির ব্যবস্থাপনায় সর্বভারতীয় সংগঠন মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে দু'দিনের এই শিবিরে ১৪টি গ্রামের প্রায় আড়াই হাজার মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছে। মেডিক্যাল ক্যাম্পের জন্য সংগঠনের সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী জেলা স্বাস্থ্য অধিকর্তার নিকট ওষুধ চাইতে গেলে তিনি সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু বেশ কিছু বিশিষ্ট চিকিৎসক, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সাংবাদিক নিঃস্বার্থভাবেই প্রায় দু লক্ষ টাকার ওষুধ সরবরাহ করেন।

মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের মোট আটজন চিকিৎসক এবং জেলার চারজন হোমিও চিকিৎসক শিবিরে অংশ নেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন, ডাঃ প্রিয়ঙ্কর নস্কর, ডাঃ পুলকেন্দু ঘোষ, ডাঃ অরবিন্দ বেরা, ডাঃ রমেন রায়, ডাঃ অনিরুদ্ধ বিশ্বাস, ডাঃ সজল সরকার সহ জেলা এম এস সি'র ডাঃ রবিউল আলম, ডাঃ এম এ সবুর প্রমুখ। চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে ডাঃ অরবিন্দ বেরা বলেন, অতিরিক্ত খাদ্যাভাব এবং দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার কারণে মূলত গ্যাসট্রাইটিস, এ্যানিমিয়া, জন্ডিস, চোখে গ্লুকোমা এবং মানসিক রোগ এই এলাকায় দেখা যাচ্ছে।'

মেডিক্যাল ক্যাম্পে এলাকার প্রায় সত্তর জন স্বেচ্ছাসেবক অংশ নেন। বিশিষ্ট যুবক ধনঞ্জয় সরকার জানান, দায়বদ্ধতার অভাবে সরকার যা পারেনি, বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির দু'দিন ধরে চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে তাদের আন্তরিকতা, দায়বদ্ধতা ও যোগ্যতা প্রমাণ করে দিল। আব্দুল মজিদ সহ সকলে এক বাক্যে বলেন, জলঙ্গীতে বেসরকারি উদ্যোগে এতবড় ক্যাম্প এই প্রথম। সজল মণ্ডল জানান, 'মানুষ আশার আলো খুঁজে পাচ্ছে। প্রমাণ হচ্ছে, আসলে আন্তরিকতা থাকলে সত্যি সত্যি কিছু করা যায়। গণপতি বিশ্বাসের বক্তব্য এই ক্যাম্পে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকরাও চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়নি।'' সত্তরোর্ধ সূর্য বেওয়া দুঃখের সাথে জানান, 'সরকার নাম মাত্র দু'ঘণ্টার চিকিৎসা শিবির করে পালিয়ে যায়। আমরা কোন সুযোগ পাইনি। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা সিপিএম কর্মী আশ্বস্ত করেন, 'এটা খুব ভাল কাজ। মাঝে মধ্যে সংগঠিত হলে ভাল হয়।'

দুদিন সমগ্র ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির অফিস সম্পাদিকা খাদিজা বানু, জেলা সদস্য গৌতম সাহা, স্থানীয় নেত্রী আছিয়া বেগম সহ ব্লক কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষক এহিয়া মণ্ডল ও আবুল কালাম শা।

জেলা নেতৃত্ব জানান, ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাব। পাশাপাশি মাসিক চিকিৎসা শিবির সংঘটিত হবে। আগামী ১২ জুন পরবর্তী চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় জনগণের মুখে মুখে ঘুরছে — ''কে বলে ডাক্তার মানেই বদমাইস? ধান্দাবাজ? এই তো দেখলাম ডাক্তার। কি ধৈর্য। কি গভীর আন্তরিকতা আর আত্মীয়ের মত ব্যবহার। এরাই ডাক্তার। সত্যিকারের ডাক্তার। এমন ডাক্তার — মূল্যবোধসম্পন্ন ডাক্তারও হয়।

দয়ারামপুরে কনভেনশন

উল্লেখ্য গত ১৩ এপ্রিল দয়ারামপুরে খোলা আকাশের নীচে এক প্রকাশ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। নানারকম বাধাবিপত্তি, সংগঠক গোপেন শর্মাকে প্রাণনাশের হুমকি সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কোন খামতি ছিল না। জোড়তলা, সাগরপাড়া, চক রামপ্রসাদ সহ ভাঙন কবলিত এলাকার পাঁচ শতাধিক নারীপুরুষ এদিনের গণকনভেনশনে অংশ নেয়। স্থানীয়দের অভিযোগ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে ৪৮৪ জন মাটি কাটার কাজ করে কিন্তু সরকার এ পর্যন্ত পারিশ্রমিক দেয়নি। উপরন্তু জলঙ্গী বিডিও গুদাম জাত পচাচাল এদের জন্য বরাদ্দ করায় দরিদ্র গ্রামবাসী তা ফিরিয়ে দেয়। বিশিষ্ট বর্ষীয়ান সাংবাদিক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী প্রত্যয় দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। জেলা যুগ্ম সম্পাদক সাধন রায় স্মরণ করিয়ে দেন, যেমন করে খড়িবোনার মানুষ শহীদ নহিরুদ্দিনের রক্তের বিনিময়ে সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করেছিল, তেমন করেই জলঙ্গীর মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে হবে। আবুল শা জামিরুন বিবি, ভানু বেওয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ আন্দোলনে পুলিশের হাতে নিগৃহীত এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক এহিয়া মণ্ডলকে সভাপতি এবং আছিয়া বেগম ও সজল মণ্ডলকে যুগ্মসম্পাদক করে চল্লিশ জনের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। সদ্যগঠিত ব্লক কমিটি বঞ্চিত মানুষের স্বার্থেই চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে।

৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯ এপ্রিল বর্ধমান শহরে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী

বহরমপুরে উদ্ধৃতি প্রদর্শনী ও বুকস্টল

এস ইউ সি আই-এর ৫৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বহরমপুর লোকাল কমিটির উদ্যোগে গত ২০-২১ এপ্রিল শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্র্যান্ট হল ময়দানের সামনে কে এল রোডে বুকস্টল ও সর্বহারার মহান নেতা, এযুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাসম্বলিত উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বিপ্লব না হলে কেন শোষিত মানুষের মুক্তি নেই, সঠিক বিপ্লবী দল চেনার উপায় কী, শ্রমিক আন্দোলনে অর্থনীতিবাদের বিপদ, ফ্যাসিবাদের নানান রূপ, বিজ্ঞান ও দর্শনের নানান দিক, মর্যাদাময় জীবনের পথ, নারী মুক্তির পথ, কৃষি সমস্যা, বেকার সমস্যা সমাধানের বিজ্ঞানসম্মত পথ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের এই উদ্ধৃতির প্রদর্শনী মানুষের মনে ব্যাপক আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

শালবনীতে বিরাট গণবিক্ষোভ

অনাহারে অর্ধাহারে ভেঙে না পড়ে জঙ্গল মহলের মানুষেরা বাঁচার দাবিতে বলিষ্ঠ ভাষা পেয়েছিল শালবনী বিডিও অফিস অভিযানের মিছিলে। 'এমনিতেই আমরা খেতে পাই না, তার উপর আবার পঞ্চায়েত কর কেন, জবাব দাও', 'জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না', 'বনাঞ্চলভিত্তিক শিল্প স্থাপন করে বেকারদের কাজের দায়িত্ব নিতে হবে', 'দলবাজি নয়, সমস্ত গরিব পরিবারকে বিপিএল তালিকাভুক্ত করতে হবে' — এই সমস্ত দাবি মুখরিত স্লোগানে গোটা বিডিও অফিস চত্বর গত ১৩ এপ্রিল কেঁপে কেঁপে উঠেছে। পুলিশ বাহিনী, যারা সাধারণ মানুষকে হয় কথায় নয় কথায় বাড়ি থেকে জঙ্গল থেকে তুলে এনে লকআপে ঢোকায়, মিথ্যা মামলায় ফাঁসায়, তারা বিশাল সংখ্যায় উপস্থিত ব্লক অফিসের বাইরে।

এস ইউ সি আই-এর ডাকে বিশাল এই মিছিল প্রথমে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায়, পরে বিডিও দপ্তরে। ইদানীংকালে শালবনীতে এত বড় জমায়েত ও গণবিক্ষোভ দেখা যায়নি। বিশেষত 'জনযুদ্ধ' নাম দিয়ে নির্বিচারে ধরপাকড়ের পরে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলার কেউ আছে বলে শালবনীর মানুষ ভেবে পাচ্ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে মানুষের উপস্থিতি এবং তাদের চোখে মুখে যে উদ্দীপনা দেখা গেল, তাতে এটা পরিষ্কার যে, এস ইউ সি আই তাদের বুকে বল জুগিয়েছে। লড়বার তেজ পেয়েছে মন ভেঙে যাওয়া মানুষেরা।

বিক্ষোভ সমাবেশে এস ইউ সি আই মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অমল মাইতি বলেন, সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘ শাসনে বেলপাহাড়ীর আমলাশোল শুধু নয়, শালবনী থানার হাজার হাজার পরিবার অনাহার অর্ধাহারে ধুঁকছে। গত মাসে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু এই শালবনীর পিড়াকাটায় মাইকের গরম দেখিয়ে কতিপয় গরিবের ঝুপড়ি উদ্বোধন করে কার্যত পরিহাস করে গেলেন। এর আগে তিনিই নির্লজ্জভাবে বলেছিলেন, শুধু আমলাশোল নয়, এ রাজ্যে আরও কত 'শোল' আছে। সরকারের এই ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে হলে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী গণকণ্ঠ চাই, বিডিও যদি দাবি পূরণ না করেন, তাহলে এসডিও, ডিএম ঘেরাও হবে। গরিবের ঘরে ঘরে হাহাকার বাড়বে, আর শাসকবাহিনীর লুঠের বাজার চলবে — এটা হতে পারে না। এলাকায় এলাকায় প্রতিরোধ চলবে।

৯ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করে জানিয়ে দেওয়া হয় দাবি পূরণ না হলে, বৃহত্তর আন্দোলন হবে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেডস্ প্রাণতোষ মাইতি, দিলীপ দাস, রবিন মাহাত, কালিপদ মাহাত, অনাদি মাহাত প্রমুখ।

দেশে ৫৩ শতাংশ শিশুই অপুষ্টির শিকার

তাতে কী হল, কিছু লোক তো ধনকুবের হচ্ছে

সংবাদমাধ্যমগুলিতে সম্প্রতি ফলাও করে লেখা হয়েছে, বিশ্বের পুঁজিমালিকদের বিত্ত প্রচারের এক নম্বর পত্রিকা 'ফোর্বস্' প্রতি বছর পৃথিবীর সেরা ধনীদের যে তালিকা প্রকাশ করে, এ'বছর সেই তালিকায় ভারত রয়েছে অষ্টম স্থানে। ভারতবর্ষে 'বিলিওনেয়ার' অর্থাৎ কমপক্ষে ১০০ কোটি ডলারের মালিক যারা, এমন মানুষের সংখ্যা ১২ জন এবং গোটা বিশ্বের মাত্র ৭টি দেশ এই দিক দিয়ে ভারতের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। সংবাদে আরো বলা হয়েছে যে, এইসব ভারতীয় ধনপতিদের মোট সম্পদের হিসাবে ভারতবর্ষের স্থান গোটা পৃথিবীর মধ্যে ত্রয়োদশ।

ইদানীং খবরের কাগজগুলিতে প্রায়ই এই ধরনের সংবাদ চোখে পড়ে। সম্পদের দৌড়ে এদেশের কোন্ পুঁজিপতি কাকে হারাতে চলেছেন, কোনো বিশেষ অনাবাসী ভারতীয় শিল্পপতি কী ধরনের 'ঐতিহাসিক' আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহের আয়োজন করলেন — সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় এ'সবের সচিত্র বিবরণ ঝলমল করে। এগুলির মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের 'ধনী' চেহারাটির প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালায় সংবাদমাধ্যমগুলি।

সম্প্রতি সংবাদে আরো প্রকাশিত হয়েছে যে, শুধু ধনপতিদের সংখ্যাবৃদ্ধিই নয়, বেশ কয়েকটি পণ্যের উৎপাদনের দিক দিয়েও ভারত আজ বিশ্বের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে। খবরে প্রকাশ, ভারতবর্ষের 'ইউ বি গ্রুপ' হল পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মদ উৎপাদক সংস্থা। এদেশেরই কোম্পানি 'হিরো হন্ডা' ২০০৪-০৫ আর্থিক বছরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ টু-হুইলার কোম্পানির মর্যাদা পেয়েছে। সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাইকেল উৎপাদন করে এদেশেরই 'হিরো সাইকেল' কোম্পানিটি। এদেশের 'সুন্দরম ফাস্নারস্' কোম্পানি গোটা বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় সর্বাধিক পরিমাণ ব্রেক লাইনিং, ফাস্নার্স এবং রেডিয়েটার ক্যাপ তৈরি করে। বিপুল পরিমাণ এই উৎপাদন হাতে-গোনা কয়েকজন ভারতীয় পুঁজিমালিকের জন্য নিয়ে আসে অঢেল মুনাফা, 'ফোর্বসে'র বিশ্বসেরা ধনাঢ্যের তালিকায় নাম ওঠে তাদের। কিন্তু নিজেদের ঘাম রক্ত ঝরিয়ে মালিকের জন্য এই মুনাফার ভাণ্ডার গড়ে তোলে নাম-না-জানা যেসব অগণিত শ্রমিক, কেমন আছে সেইসব খেটে খাওয়া মানুষগুলো? রাষ্ট্রসংঘের শিশুকল্যাণ বিষয়ক দপ্তর 'ইউনিসেফ'-এর রিপোর্টে তার এক ভয়াবহ চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যার দিক দিয়ে এবং ৫ বছরের কম বয়সী অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যার দিক দিয়ে গোটা বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষ আজ প্রথম স্থান দখল করেছে। রাষ্ট্রসংঘের মানব উন্নয়ন সূচক অনুযায়ী, দেশের ৮০ ভাগ সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানের নিরিখে বিচার করলে ভারতবর্ষ আজ সারা পৃথিবীর মধ্যে ১২৭তম স্থানে নেমে এসেছে। ৫ বছর আগে ভারতীয় পরিবারগুলি খাদ্য হিসাবে বছরে গড়ে যে পরিমাণ খাদ্যশস্যের সংস্থান করতে পারত, এখন তার পরিমাণ বছরে গড়ে ১০০ কি.গ্রাম কমে গিয়েছে। (সংবাদ প্রতিদিন ১-৩-০৪) এবং বেঁচে থাকবার জন্য একজন মানুষের প্রতিদিন যত ক্যালরি শক্তিদায়ক খাদ্য প্রয়োজন, এদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ মানুষই তার থেকেও ৬০০ ক্যালরি কম পায়। (প্রতিদিন ২২-৩-০৪)।

ভারতীয় ধনকুবেরদের মোট সম্পদের পরিমাণ যখন বিশ্বের বহু দেশের ধনাঢ্যদের পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে, তখন 'ইউনিসেফ' তার রিপোর্টে ভারতবর্ষের শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানের যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাও অতি ভয়ঙ্কর। শিশুদের বলা হয় দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। একটি দেশের শিশুদের জীবনযাত্রায় সামগ্রিক মান কতটা উন্নত, তা দেখে সেই দেশের আর্থিক উন্নয়নের চিত্র পাওয়া যায়। 'ইউনিসেফ' ২০০৫ সালের রিপোর্টে বলেছে, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, পানীয় জল ও বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ভারতের ৬৩ শতাংশ শিশু একপেট খিদে নিয়ে রাতে শুতে যায়। এই শিশুদের ৫৩ শতাংশই স্থায়ী অপুষ্টির শিকার। বলা হয়েছে, এদেশের প্রায় ৩ কোটি শিশু ফুটপাতের নোংরা এবং দূষিত পরিবেশে জন্ম নেয়, সেখানেই জীবন কাটায়। নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া বা ধনুষ্টঙ্কারের মতো রোগ যা সহজেই প্রতিরোধ করা যায়, সেই সমস্ত রোগে ভুগে এদেশের বিপুল সংখ্যক শিশুর মৃত্যু হয়। দেড় কোটির বেশি শিশু ভিটামিন 'এ'-র অভাবে দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতায় ভোগে।

ভারতের শিশুদের শিক্ষার হালও তথৈবচ। 'ইউনিসেফ' রিপোর্টে বলেছে, এদেশের ৩ কোটি ৩০ লক্ষ শিশু স্কুলের মুখ দেখতে পায়না এবং ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী ৭ কোটি ২০ লক্ষ বালক-বালিকা বুনিয়াদি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এই হল 'ধনী'(!) ভারতবর্ষের শিশুদের অবস্থা। আর তাদের মায়েরা কেমন আছেন? গত ২৩ মার্চ লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী রামদাস নিজেই স্বীকার করেছেন যে, অর্ধাহার ও অপুষ্টির কারণে ভারতবর্ষের প্রায় ৫২ শতাংশ মহিলা রক্তাল্পতায় ভোগেন।

অর্থাৎ, বিশ্বখ্যাত 'ফোর্বস' পত্রিকায় যখন ভারতবর্ষের গুটিকয়েক পুঁজিমালিক ধনকুবেরের নাম জ্বলজ্বল করছে, তখন দেশের সিংহভাগ মানুষের জীবন ডুবে রয়েছে দারিদ্র্যের গভীর অন্ধকারে। মানুষে মানুষে এই প্রবল বৈষম্য আপাতভাবে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেও তা আদৌ অস্বাভাবিক বা বিক্ষিপ্ত কোনো ঘটনা নয়। এ'হল পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। সমাজের ব্যাপক অংশের মেহনতি মানুষের শ্রমশক্তি নিংড়ে নিয়ে তাদের জীবনকে ক্রমাগত অধিকতর দুর্গতির মধ্যে ঠেলে দেওয়ার মাধ্যমেই এই শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অল্প কয়েকজন পুঁজিমালিকের মুনাফার ভাণ্ডার স্ফীত হতে থাকে। 'ফোর্বস' পত্রিকায় ভারতীয় 'বিলিয়নেয়ার'দের নাম প্রকাশিত হওয়ার ঘটনা এই সত্যকেই নতুন করে চোখের সামনে নিয়ে এল। প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীবিভক্ত ভারতীয় সমাজে মালিক শ্রেণী ও মেহনতি জনতার আয়, সম্পদ ও জীবনযাত্রার মানের মধ্যে যে বিরাট ফারাক পরাধীন ভারতে ছিল, স্বাধীনতা লাভের পরে লাগাতারভাবে এই ফারাক ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েই এসেছে। '৯০-এর দশকে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া শুরু হবার সময়ে এদেশের নীতি-নির্ধারকরা দাবি করেছিলেন, উদার আর্থিক নীতি নাকি এই বৈষম্যকে ক্রমশ কমিয়ে আনবে; উদারনৈতিক উন্নয়নের মডেলে গরিব মানুষের গরিবি দূর হবে। পুঁজিবাদী শাসকদের সাথে সুর মিলিয়ে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের শরিক তথাকথিত 'বিশেষজ্ঞরা' এখনও পাতার পর পাতা লিখে বোঝাবার চেষ্টা চালাচ্ছেন যে, পুঁজিবাদের নয়া উদারনীতির রাস্তায় গরিবেরই কল্যাণ হবে। অথচ, গত ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে ঠিক বিপরীত। দেখা যাচ্ছে, নয়া উদারনীতি চালু করার আগে যে প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদী শোষণ চলত, যার পরিণামে ধনী পুঁজিপতিরা আরও ধনী এবং গরিব আরও গরিব হত, এখনও সেটাই ঘটছে। শুধু নয়, ধনীর ধনবৃদ্ধি হচ্ছে আগের চেয়ে দ্রুতহারে, গরিবের গরিবিও বাড়ছে ততটাই দ্রুতহারে। এভাবেই গরিবের উন্নয়নের কথা বলে পুঁজিবাদের নয়া উদারনৈতিক মডেল অত্যন্ত নগ্নভাবেই ধনকুবের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখছে।

নির্বাচন কমিশনের সুপারিশ

প্রতারণার নতুন কৌশল

গত ২২ জানুয়ারি নয়া দিল্লীতে এক আলোচনা সভায় নির্বাচন কমিশনার টি এস কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন যে, নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই রাজ্যের মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে হবে — ব্যতিক্রম শুধু মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বলা হয়েছে, এই সুপারিশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। তিনি বলেছেন, নির্বাচনের অন্ততঃ তিনমাস আগেই রাজ্য সরকার ভেঙে দেওয়া উচিত। রাজ্য সরকারগুলির অবাঞ্ছিত সুবিধাভোগ বন্ধ করা, প্রচারমাধ্যমে মন্ত্রীদের ছবি ছাপানো এবং দাগী আসামীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা ও আমলাদের ওপর কড়া নজরদারি সহ ২২ দফা সুপারিশ সরকারের কাছে কৃষ্ণমূর্তি পাঠিয়েছেন। অবশ্য এমন ধরনের সুপারিশ এই প্রথম নয়। এর আগে এই ধরনের সুপারিশ করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কশিনার এম এস গিল। তাঁর প্রস্তাবে ছিল পুরো সরকারকেই পদত্যাগ করতে হবে। নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিনি রাজ্যের হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদেরও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছিলেন।

আমাদের দেশে নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত। কমিশনকে কোনও সরকার নাকচ করতে পারেনা, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ ও কর্মকাণ্ডকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কেউই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের যে রীতি ও পদ্ধতি — অর্থাৎ ইমপিচমেন্টের মাধ্যমে অপসারণ করা, নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৩২৪ ধারা ও ৫নং উপধারা অনুযায়ী তা করতে হবে। এমন ক্ষমতাধর ভারতীয় নির্বাচন কমিশনও অবাধ, ভয়মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে এত অসহায় কেন? কেন বারবার নতুন নতুন প্রস্তাব আনতে হচ্ছে? তা সত্ত্বেও কেন নির্বাচন প্রহসন হয়ে উঠছে?

দ্বিতীয়ত, প্রশ্ন হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবগুলি কার্যকর করা কতটা বাস্তবে সম্ভব এবং প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করলেই কি অবাধ, হস্তক্ষেপমুক্ত শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা সম্ভব? ক্রিমিনালদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ আটকাতে অনেক বছর ধরে অনেক নির্দেশ কমিশন দিয়েছে, তাতে কি ক্রিমিনালদের অংশগ্রহণ আটকানো গিয়েছে? টাকার জোরে ভোটকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করা ঠেকানোর কথা বলে নির্বাচনের জন্য ব্যয়ের সীমা কি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে? অভিজ্ঞতা বলে আদপেই সম্ভব হয়নি। বরং অবাঞ্ছিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়ানোর অজুহাতে নির্বাচনে জামানতের টাকা এক হাজার গুণ বৃদ্ধি ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের, গরিব মানুষের পার্টির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। নির্বাচনের সুযোগ কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে ধনীদের হাতেই। সেই অর্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সার্বজনীন অধিকার সংকুচিত হয়েছে। এখনও বলা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীদের পদত্যাগ করার দরকার নেই। অন্য মন্ত্রীরা করুন। তা প্রশাসন যন্ত্র তো এদেরই আজ্ঞাবহ। এই পদক্ষেপ রূপায়িত হলেই বা নিরপেক্ষ প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভোট প্রক্রিয়া কিভাবে নিশ্চিত হতে পারে? আবার সরকার যদি পদত্যাগই করে, তাহলেই বা সুরাহা কি হবে? সরকার পদত্যাগ করলেই যদি মুক্ত, অবাধ, নির্বাচন হবে বলে দাবি করা হয়, তবে ইতিপূর্বে রাজ্যপালের শাসনে কি কখনও ভোট হয়নি ? সেখানে ভোট অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে কি ? বাংলাদেশের নির্বাচনের আগে সরকার পদত্যাগ করে। তাতে কি সেখানে কারচুপি, বুথদখলসহ খুন খারাপী, টাকা দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগ উঠছে না? সরকার ক্ষমতায় থাকা বা না-থাকা কি আদৌ নিরপেক্ষ প্রশাসনের গ্যারান্টি দিতে পারে? এমন অনেক প্রশ্নই উঠছে, প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।

দীর্ঘকাল ধরেই অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন করার অধিকার দিয়ে নির্বাচনে কমিশনকে বলীয়ান করা হয়েছে। অন্ততঃ এটাই মানুষের বিশ্বাস। এইজন্যই নির্বাচন কমিশন যে মতামত দিয়ে থাকে, নাগরিকরা তা গুরুত্বের সাথেই বিবেচনা করে। রাষ্ট্রনায়করাও প্রচার মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে কমিশনের একটা নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি তৈরী করার চেষ্টা করে। এমন ধারণাও সৃষ্টি করে যেন কমিশন স্বাধীন ও প্রকৃত ক্ষমতাধর সংস্থা। এর ফলে জনতার মধ্যে কখনও কখনও একটা প্রত্যাশাও তৈরী হয়। মানুষের এই প্রত্যাশা আর বাস্তবে যা ঘটছে, এই দুইয়ের ভেতর যে বিরাট ফারাকটা মানুষের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে, সেই সমস্যাকে সামাল দিতেই নির্বাচন কমিশনের কর্মনীতি ও সুপারিশে নতুন নতুন নির্দেশ, বিধি ইত্যাদি হাজির করা হয়। নির্বাচনগুলোতে খুন, জখম, বুথ দখল উৎকোচ দেওয়া, টাকা দিয়ে ভোট কেনা ইত্যাদি এতই ব্যাপকতা পেয়েছে এবং ক্রমশঃ বাড়ছে যে মনে হয় এগুলি যেন নির্বাচনেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এমনভাবে এগুলি এসেই গিয়েছে যে, অবাধ, শান্তিপূর্ণ, সরকার ও প্রশাসনের প্রভাবমুক্ত কোনও ভোট আদৌ হতে পারে, এ বিশ্বাসই আজ জনমানসে নেই। শুধু ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতার দাবীদার রাজনৈতিক দলগুলি নয়, প্রশাসনও প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দু'ভাবেই ভোটযন্ত্র ও বুথ দখল করে। এ জিনিষ আখছার ঘটছে। ভোটার লিস্টে ক্ষমতাসীন দলের লোকের নাম রেখে, নাবালকদের পর্যন্ত নাম ঢুকিয়ে বিপক্ষ দলের ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে ভোটার লিস্ট তৈরী করা আজ নিয়মে পর্যবসিত হয়েছে।

অবস্থা এমন হয়েছে যে, ভোটাররাই আজ দাবি তুলছে, প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো প্রার্থীকেই পছন্দ না হলে ভোটারদের তা জানাবার সুযোগও ব্যালটপত্রে রাখতে হবে — যাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে কেউ বাধ্য না হয়। ভোট কেন্দ্রে না গেলেও ভোটাররা দেখে, তার ভোট পড়ে গিয়েছে। এজন্য গভীর বিতৃষ্ণা নিয়েও ভোট কেন্দ্রে মানুষ যায়, এমনকী ব্যালটপেপারে একাধিক প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীকে ছাপ দিয়ে ভোট নষ্ট করার ঘটনাও এখন কিছু কম হচ্ছে না। দিন দিন সাধারণ মানুষের ভোট দেবার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে। ভোটের বাক্সে ভোটদাতাদের শতকরা হার যা পাওয়া যায়, তার বেশিরভাগই প্রকৃত ভোট নয়। এমন এক অবস্থার নিরিখেই সাম্প্রতিক সুপারিশগুলি বিচার করা ও বোঝা দরকার। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, কোনো সুপারিশেই কিন্তু আজ পর্যন্ত নির্বাচিত প্রার্থী প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার (right to recall) কখনই উত্থাপিত হয়নি।

দুনিয়ায় সামন্ততান্ত্রিক শাসনকে ভেঙ্গে নতুন জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রশাসন, আইন ও বিচার — এই তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা ও অধিকারের বিভাজন করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, প্রতিটি বিভাগ নিজ নিজ ক্ষেত্রে অপর বিভাগের হস্তক্ষেপমুক্ত থাকবে ও আপেক্ষিক স্বাধীনতা ভোগ করবে। এর দ্বারা ক্ষমতার একটা ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা হবে। ফরাসী রাষ্ট্র বিজ্ঞানী মঁতেস্কু এই তত্ত্বের উদ্ভাবক। তিনি তাঁর বিখ্যাত ''স্পিরিট অব ল'' বইটিতে দেখাবার চেষ্টা করলেন, এভাবেই রাষ্ট্রের প্রত্যঙ্গগুলি স্বাধীনভাবে পরস্পর হস্তক্ষেপ মুক্ত হয়ে কাজ করতে পারলেই নাগরিকদের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা এবং মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে। এইভাবেই এল জনগণের ইচ্ছার মূর্ত প্রতীকরূপে পার্লামেন্টের ধারণা — যে পার্লামেন্ট গঠিত হবে জনগণের ভোটে নির্বাচনের দ্বারা। আর এল সংবিধান। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই যুগটা ছিল পুঁজিবাদের অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ। এই যুগেরই ধ্বনি — গভর্নমেন্ট অফ দি পিপল, বাই দি পিপল্, ফর দি পিপল্। রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেদিন ব্যক্তির এবং নাগরিকদের সশস্ত্র প্রতিরোধ ন্যায়সঙ্গত হয়ে উঠেছিল। অবাধ প্রতিযোগিতার পুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগে অর্থনীতির ভিত্তির উপরকাঠামো হিসাবে নির্বাচিত সরকার, ভোটাধিকার, আইন, আদালত, প্রশাসন এবং চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। সামন্তীযুগের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন শোষণের তুলনায় অনেক উন্নত মানবতাবাদী মূল্যবোধ, ন্যায়নীতির আধারে আইন প্রশাসন অনেকখানি নিরপেক্ষ সৎ ও পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। এই যুগ মানবসভ্যতাকে বহুদূর এগিয়েও দিয়েছে। ধর্ম, জাতি, বর্ণভেদনিরপেক্ষ এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণা প্রগতির প্রতীক হয়ে ওঠে। 'মানুষ সমঅধিকার নিয়েই জন্মায় এবং সেই অধিকার তার জীবনব্যাপী' ফরাসী বিপ্লবের এই ধ্বনি দুনিয়ায় সেদিন ঝড় তুলেছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হল, তখন আন্তর্জাতিক স্তরে পুঁজিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছেছে। স্বভাবতই জাতীয়তাবাদী আদর্শ যখন আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গিয়েছে, তখন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যের পটভূমিতে প্রগতিশীল হলেও তা বিপ্লবাত্মক হওয়া সম্ভব ছিল না। এদেশে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল আপসকামী ও বিরুদ্ধবাদী ভূমিকায় — যার প্রতিফলন ঘটল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ধর্মবর্ণ জাতিভেদ, প্রাদেশিকতার আমূল উচ্ছেদ, উপজাতীয় মানসিকতার অবসান, শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব সংগঠিত করার কাজ অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ করতে হলে আবশ্যিক ছিল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতিতে পৌঁছাতে হলে এই বিশেষ যুগে এই বিশেষ শর্তটি পূরণ করতেই হবে। যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি এদেশে না থাকায় তা সম্ভব হয়নি।

ফলে ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে বৃটিশের ঔপনিবেশিক পীড়নের জন্য তৈরী শাসনযন্ত্র, রাষ্ট্রযন্ত্রের মালিক হল ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী। বিশেষ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেল। আইনে, আদালতে প্রশাসনে, গোটা মিলিটারীর মধ্যে, সর্বক্ষেত্রেই জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশেষ সীমাবদ্ধতার দরুন ঐতিহাসিক দূষণটি থেকে গেল। রাজনীতিতে, সমাজে, সংস্কৃতিতে, প্রশাসনে, আমলাতন্ত্রে, সমর বিভাগে সর্বত্রই জাতপাতের প্রভাব, প্রাদেশিকতার বিষ, ধর্ম-বর্ণের অন্ধ কলুষতার প্রভাব, উপজাতীয় কূপমণ্ডুকতার প্রভাব সবই থেকে গেল প্রবলভাবে। প্রশাসনের সততা, নিরপেক্ষতা, পরিচ্ছন্নতা, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধ এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার কোনো গভীর শিকড় রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গে প্রোথিত থাকা আদৌ সম্ভব হলনা। 'হিন্দু পুলিশ', 'হিন্দু মিলিটারি' তাই আজও দেখতে পাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়। দেখতে পাওয়া যায় 'হিন্দু' প্রশাসনের তাণ্ডব। রাজনীতিতেও দেখি অবিপ্লবী পরিষদীয় দলগুলিতে ধর্ম, বর্ণ, প্রাদেশিকতার গভীর প্রভাব। প্রতিটি ভোটেই জনগণের মধ্যে টিকে থাকা এই সামন্তী সংস্কৃতি ও ভেদবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ভোট সংগ্রহের নোংরা খেলা এজন্যই আমরা আজও দেখতে পাই। এগুলি হাতিয়ার করে ক্ষমতা দখলের নোংরা খেলা সফলও হয় বারবার। সংখ্যালঘুরা আজও এদেশে বিপন্ন বোধ করে। কি অসহায় অবস্থা হরিজন ও নিম্নবর্ণের মানুষের। এদের ওপর প্রতিদিন কি বর্বরতাই না চলে। এসব চলে প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে। মণিপুর, আসাম, নাগাল্যান্ড, কাশ্মীরসহ বহু রাজ্যে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও মিলিটারির বীভৎসতা কে না জানে? দেশের রক্ষকদের হাতেই দেশের মানুষ, বিশেষত মা-বোনেরা কতই না বিপন্ন! এদেশে প্রাদেশিকতাকে ব্যবহার করে কত দাঙ্গা হয়ে যাচ্ছে। থানা লক্‌আপে বন্দীর উপর অকথ্য অত্যাচার ও বন্দীহত্যা রাজ্যে রাজ্যে প্রশাসনের চরিত্র উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। প্রকাশ্য রাজপথে এই পশ্চিমবঙ্গেই তথাকথিত 'বাম' শাসনে মহিলারা বেআব্রু হল গণআন্দোলনের ময়দানে — পুলিশ প্রশাসনের দ্বারা! গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মূল্যবোধ, অধিকার আজ ধূলায় লাঞ্ছিত।

এমন এক পটভূমিতে 'আইনকে আইনের পথে চলতে হবে', 'প্রশাসনের নিরপেক্ষতা', 'কমিশনের নিরপেক্ষতা', 'অবাধ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি' ইত্যাদি কি প্রহসন নয়? যতটুকু নিরপেক্ষতা, সততা, দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ, অবাধ নির্বাচন একদিন পাশ্চাত্য দুনিয়ায় দেখা যেত আজ সেখানেও 'অবাধ মুক্ত নির্বাচনকে' জনতা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। খোদ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়েও হাজার অভিযোগ উঠেছে। এ প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। তা হচ্ছে, সরকার অস্থায়ী — রাষ্ট্রযন্ত্র স্থায়ী। সুতরাং নির্বাচনের চরিত্র কেমন হবে, তা প্রধানত নির্ভর করতে বাধ্য প্রশাসন ও রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপরই। নীতিতে যাই বলা হোক, সরকার ও কমিশনের সুপারিশ যাই থাক, তার প্রয়োগে চূড়ান্তভাবে নিয়ামক ভূমিকায় থাকে আলোচিত বিশেষ প্রশাসন ও রাষ্ট্রযন্ত্র। সুতরাং সরকারের পদত্যাগ করা না করায় বাস্তবের তারতম্য তেমন কিছুই হবে না।

ইতিহাসের গতিপথে গণতন্ত্র সর্বত্রই তার পূর্বেকার চরিত্র হারিয়েছে। ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গণতন্ত্র বা সার্বজনীন গণতন্ত্র হচ্ছে আসলে পুঁজিপতিশ্রেণীর গণতন্ত্র — সর্বহারা শ্রেণীর ওপর জবরদস্তি চাপিয়ে রাখা একনায়কত্ব। তার এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য ভুললে কোনভাবেই চলবে না। সুতরাং বুর্জোয়া গণতন্ত্রে অর্থাৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে, কলকারখানার মালিকদের, পুঁজিপতিদেরই সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য থাকে। তাদের স্বার্থেই অর্থাৎ তাদের শোষণ ও নিপীড়নের স্বার্থেই সংবিধান, আইন আদালত, সরকার ও প্রশাসন কাজ করে। পুঁজিবাদে বাজার সংকট বৃদ্ধির সাথে সাথে, শোষণের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধির সাথে সাথে, শোষক ও শোষিতের মধ্যে অনিবার্য সংঘর্ষের পরিণতিতে আইন আদালত, প্রশাসন, সরকারী নীতি এবং সংবিধান পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে বদলায়। মৌলিক বিচারে এগুলি এক থাকলেও নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর বিশ্বায়নের দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শিবির শোষিত জনগণের উপর বেপরোয়া আক্রমণ শানাচ্ছে। দেশে দেশে গণতন্ত্রের আবরণ সরে গিয়ে শ্রেণীনিপীড়নের রূপটাই কুৎসিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ভারতবর্ষ তার ব্যতিক্রম নয়। জাতপাত, ধর্ম, বর্ণ, প্রাদেশিকতা, ইত্যাদির সঙ্গে পুঁজিবাদ কেবল আপসই করছে না, পুঁজিপতিশ্রেণীর দলগুলি পুঁজিপতিদের স্বার্থে এগুলিকে হাতিয়ার করে নির্বাচনে গদী দখলের রাজনীতি চালাচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ধ্বংস করে এভাবেই পুঁজিপতিশ্রেণী ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই ঐতিহাসিক দূষণটি সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রে কমছে না, বরং বাড়ছে। ক্রমাগত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি খর্ব করা হচ্ছে। দেশে দেশে পার্লামেন্টের ঠাটবাট বজায় রেখে ফ্যাসিবাদ কিভাবে কায়েম হয়েছে, ইতিহাস তার সাক্ষী। পার্লামেন্টকে এড়িয়ে গিয়ে হাজার একটা অর্ডিন্যান্স জারি করে নিত্যনতুন অর্থনৈতিক-

ছয়ের পাতায় দেখুন

ইরাকে মার্কিন গণতন্ত্রের চেহারা

ইরাকে সাদ্দাম জমানার তথাকথিত 'দমবন্ধ করা অত্যাচারের' অবসানের পর ইতিমধ্যেই ২ বছর অতিক্রান্ত। ইরাক দখলের সময় আমেরিকার দেওয়া 'মুক্ত' গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতির এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসাবে এর মধ্যে সেখানে নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেও প্রায় ২ মাস হয়ে গেল। কিন্তু বাস্তবে ইরাক এখনও পড়ে রয়েছে সেই তিমিরেই। প্রতিদিন রক্তপাত, অনাহার, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জিনিসপত্রের তীব্র অভাব ও চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা আজও সেখানে সাধারণ মানুষের নিত্যসঙ্গী। এইরকম অবস্থায় দখলদার মার্কিন বাহিনীর প্রহরায় নির্বাচনের ও 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার'-এর বক্তৃতা প্রহসন নয় কি?

একটু ফিরে দেখা যাক ইরাকের বর্তমান 'গণতন্ত্রে' সেখানকার মানুষের প্রকৃত অবস্থাটা কীরকম বা যুদ্ধপূর্ব ইরাকের তথাকথিত 'অন্ধকারময়' সময়ে তাদের পরিস্থিতির তুলনায় তা আজ কতটাই বা উন্নত। বর্তমান 'মুক্ত' ইরাকে মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৬০ শতাংশই বেকার। যুদ্ধপূর্ব সাদ্দাম জমানায় কিন্তু এই বেকারসংখ্যা কখনই ৩০ শতাংশের উপরে ছিল না (থার্ড ওয়ার্ল্ড রিসার্জেন্স পত্রিকা, ৫ মার্চ, ২০০৫)। অর্থাৎ, মার্কিন বাহিনী ইরাকিদের শুধু রাজনৈতিক বন্ধন থেকেই মুক্ত করেনি, তাদের নানারকম কাজের এবং তার উপযুক্ত সম্মানজনক পারিশ্রমিকের বন্ধন থেকেও 'মুক্ত' করে ছেড়েছে।

২০০৪ সালের জুন মাসের শেষদিকে মার্কিন কংগ্রেসে ইরাকের উপরে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়, তাতে স্বীকার করা হয়েছে যে, গত ২০০৩ সালের মে মাসে অর্থাৎ ইরাক যুদ্ধের ঠিক পরেও যুদ্ধজনিত বিপুল ধ্বংস সত্ত্বেও ইরাকের ১৮টি প্রদেশের মধ্যে অন্তত ৭টিতে দিনে ১৬ ঘন্টারও বেশি বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় ছিল। অথচ বর্তমানে এমনকী ৫০ লক্ষ অধিবাসীর শহর খোদ রাজধানী বাগদাদেও যদি কখনও দিনে ঘন্টা ছয়েক আলো পাওয়া যায় তো বাসিন্দারা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেন (রিসার্জেন্স, ঐ)।

অধিকৃত ইরাকে গত ২২ মাসে চিকিৎসা ব্যবস্থারও ক্রমাগত অবনতি ঘটেছে। হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার ন্যূনতম সরঞ্জামেরও চূড়ান্ত অভাব। ওষুধপত্র প্রায় পাওয়া যাচ্ছে না বললেই চলে। বহু রাস্তাঘাট বন্ধ থাকায় এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার কড়াকড়ির ফলে অনেক রোগীর পক্ষেই আজ হাসপাতালে পৌঁছান এক প্রবল ঝকমারি। তার ওপর হাসপাতালগুলিতে ডাক্তারদের নিরাপত্তাও খুব একটা সুনিশ্চিত নয়। ওষুধপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে অনেক সময়ই তাঁদের অসহায়ভাবে রোগীর মৃত্যু দেখা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। কিন্তু বর্তমান 'তথাকথিত গণতান্ত্রিক' সরকারের এ ব্যাপারে কোন হেলদোল নেই। সাধারণ মানুষের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা বা চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার থেকে তাদের কাছে এখন অনেক বেশি জরুরি হল সুরক্ষিত 'গ্রিন জোনের' মধ্যে বসে দখলদারি মার্কিন বাহিনীর তাঁবেদারি করা। সে কাজের প্রকৃতি যে কতটা 'গণতান্ত্রিক' তা বলাই বাহুল্য।

পুলিশবাহিনী একে দুর্বল, তায় তার প্রধান কাজ তথাকথিত 'জঙ্গি'দের খুঁজে বের করা। ফলে দেশে সাধারণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ প্রায় উঠে গেছে বললেই চলে। আর সেই সুযোগে সক্রিয় হয়ে উঠেছে নানা সমাজবিরোধী দল, যাদের সহজতম লক্ষ্য হলেন নিরাপত্তাহীন চিকিৎসকরা। ফলে চলছে একের পর এক চিকিৎসকের অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের খেলা। এইভাবে প্রায় কয়েকশো চিকিৎসককে অপহরণ করা হয়েছে এবং আরও অপহরণের হুমকি দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত এবং সুদক্ষ ডাক্তার। বাধ্য হয়ে এঁদের অনেকেই এখন দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন, যার ফলে দেশের চিকিৎসা পরিকাঠামো যা ছিল, তাও প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে মনে রাখার বিষয় হল, এইসব সুদক্ষ ডাক্তারদের কাউকেই কিন্তু 'একনায়ক' সাদ্দামের 'স্বৈরতন্ত্রী' শাসনের সময় এভাবে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়নি। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর অবরোধের ফলে ওষুধপত্রের প্রবল অভাব থাকলেও সেদিন আজকের মত অন্তত বিনাচিকিৎসায় কাউকে মরতে হত না। বাস্তবে এই অবস্থা পুরোপুরি নতুন 'মুক্ত' ইরাকের আইনশৃঙ্খলাবিহীন মাৎস্যন্যায়েরই ফল।

অবস্থা যে সত্যিই কতটা ভয়াবহ, তা ধরা পড়ে ইরাকে নিযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনের বিশেষজ্ঞ, জ্যঁ সিগলারের কথায়। জেনিভাতে রাষ্ট্রসংঘের কাছে 'খাদ্যের অধিকার' সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, ইরাকে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর সংখ্যা বর্তমানে দু'বছর আগের যুদ্ধপূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে যখন বাগদাদের পতন ঘটে, তখন ঐ চূড়ান্ত ধ্বংসের মধ্যেও, পাঁচ বছরের কম বয়স্ক ইরাকি শিশুদের মাত্র ৪ শতাংশকে অনাহারে দিন কাটাতে হয়েছিল। অথচ বর্তমানে, এত পুনর্গঠন ও উন্নয়নের ঢাকঢোল পেটানো সত্ত্বেও এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৭ শতাংশ। অর্থাৎ আগের প্রায় দ্বিগুণ। শুধু তাই নয়, বর্তমানে ২৫ শতাংশেরও বেশি ইরাকি শিশুর দৈনিক প্রয়োজনীয় খাবার জোটে না। অনাহারে, অর্ধাহারে তাদের দিন কাটাতে হয়। ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসের একটি মার্কিন সমীক্ষারই উল্লেখ করে সিগলার আরও বলেন যে, ইরাক দখলের পর থেকে এ পর্যন্ত এক লক্ষেরও বেশি ইরাকির মৃত্যু ঘটেছে, যাদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যকই মহিলা এবং শিশু। যুদ্ধের আগে সাদ্দাম জমানায় মৃত্যুর এই হার ছিল অচিন্তনীয় [দি নিউ ওয়ার্কার, (লন্ডন) ১-৪-০৫]।

রেকর্ড ঘাঁটলে দেখা যায় যে, আগে ইরাক থেকে তুরস্কের মধ্য দিয়ে দৈনিক ১ লক্ষ ব্যারেল পরিশোধিত ডিজেল ও অন্যান্য পেট্রোপণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হত। এই তথ্য থেকে বেশ পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে, সেইসময় ইরাকের তৈলশোধনাগারগুলির সেইরকম অতিরিক্ত ক্ষমতা ছিল, যার বলে সেদেশের পক্ষে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাইরে এই পরিমাণ পরিশোধিত তেল রপ্তানি করা সম্ভব হত। এবারের যুদ্ধে কিন্তু ১৯৯১ সালের মত এই তৈল শোধনাগারগুলি ধ্বংস হয়ে যায়নি। বরং আমেরিকানরা এগুলি রক্ষা করারই চেষ্টা করেছিল এবং তা করেও ছিল। অথচ, আজকের 'মুক্ত' ইরাকের নাগরিকরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছে যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার ২২ মাস পর আজও তাদের সরকার তুরস্ক, কুয়েত, সৌদি আরব এমনকী ইজরায়েল থেকেও বিপুল অর্থের বিনিময়ে পরিশোধিত তেল আমদানি করে চলেছে। কি করে যে তাদের দেশ তেলের রপ্তানিকারক থেকে এমন একটি আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়ে গেল, তাদের মাথায় তা কিছুতেই ঢুকছে না। অথচ আজকের 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক' দেশে এই ন্যায্য প্রশ্নটি উত্থাপন করার কোনও অধিকারই তাঁদের নেই। (রিসার্জেন্স, মার্চ ২০০৫)

১৯৯১ সালে আমেরিকার তীব্র বোমা বর্ষণের ফলে এই তৈল শোধনাগারগুলি প্রবল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যুদ্ধের পর দেশের উপর প্রবল অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, বাইরের কোনও সাহায্য ছাড়াই ইরাকি জনগণের পক্ষে কিন্তু এগুলি কিছুদিনের মধ্যেই সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। তারপর ১৩ বছর ধরে এগুলি শুধু চালুই ছিল না, এগুলি থেকে বাইরেও তেল রপ্তানি করা হত। ঠিক একইভাবে ইরাকের মানুষ সেদিন যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সামলে কয়েকমাসের মধ্যেই বিদ্যুৎ সরবরাহও পুনরায় চালু করতে সক্ষম হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সে সময় এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিভিন্ন বাড়িঘরকেও সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। অথচ আজ 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক নতুন' ইরাকে যুদ্ধের ২২ মাস পরেও অবস্থা তথৈবচ, এমনকী কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও খারাপ।

১৯৯১ সালে আমেরিকা দম্ভ করে বলেছিল যে, ইরাককে তারা 'শিল্পায়ন-পূর্ববর্তী' দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেবে। বোমা ফেলে ফেলে প্রায় সবকিছু ধ্বংস করে দিয়ে তা তারা প্রায় করেও ছিল। কিন্তু অসাধারণ উদ্যম ও সাহসে ভর করে ইরাকের মানুষ সেদিন সবকিছু পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। আজকের 'গণতান্ত্রিক' ইরাকে কিন্তু সেই উদ্যমের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই।

১৩ বছর ধরে চলা অনৈতিক অবরোধের সময় প্রত্যেক ইরাকির জন্য দৈনিক বরাদ্দ ছিল ২২০০ কিলোক্যালরি খাদ্য। রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার তা সুষ্ঠুভাবে সকল নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্তও করেছিল। সেদিন আমেরিকা থেকে প্রচার করা হয়েছিল যে, এই রেশন ব্যবস্থা নিয়ে দুর্নীতি চলছে এবং বাস্তবে ইরাক সরকার এইভাবে নাগরিকদের বঞ্চিত করছে। অথচ 'গণতান্ত্রিক' ইরাকে যুদ্ধের ২২ মাস পরও নাগরিক পিছু খাদ্য বরাদ্দ কিন্তু রয়ে গেছে সেই ২২০০ কিলো ক্যালোরিই। যদিও এখন তা সকলের হাতে পৌঁছানোর ব্যাপারটা আর আগের মত সুনিশ্চিত নয়। অপরদিকে সেদিন ইরাকে খাদ্য আমদানি ও তা সুষ্ঠুভাবে বন্টনের জন্য মাসে ১৫ কোটি ডলারের মত সরকার থেকে খরচ করা হত। বর্তমানে আমেরিকার সিপিএ ইন্সপেক্টর জেনারেলের মতেই এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বছরে ৮৮০ কোটি ডলার। সবকিছু ঠিকঠাক চললে এই টাকায় ইরাকের সব মানুষকে ৬০ মাস বা পাঁচ বছর ভালভাবে খাবার দেওয়া সম্ভব। অথচ এখন পরিস্থিতি আগের চেয়েও খারাপ। পুরো প্রকল্পে জনগণের বিপুল টাকা খরচ করা হচ্ছে। অথচ কাদের পেটে তা যাচ্ছে, হিসাবে তা জানা যাবে না। এরই নাম কি 'গণতন্ত্র'? (রিসার্জেন্স, ৪ মার্চ, ২০০৫)

গণতন্ত্র কথার অর্থ যদি হয় সমস্ত কিছুর উপর সাধারণ মানুষের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, তবে বর্তমানে আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় ইরাকে যা চলছে তা গণতন্ত্রের ভণিতার আড়ালে এক ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী দখলদারী ছাড়া কিছু নয়। স্বভাবতই এর বিরুদ্ধে জনমানসে প্রবল ঘৃণা ও ক্ষোভ বাড়ছে, যা রূপ নিচ্ছে সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে। তাই বীভৎস বর্বর অত্যাচার চালিয়েও ইরাকে গণসংগ্রাম দমন করা সম্ভব হচ্ছে না। বরং তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এমনকী ফালুজাতে এক রক্তক্ষয়ী অভিযানের পরও মার্কিন সেনারা আগের মতই আক্রান্ত হয়ে চলেছে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দীশিবির বুক্কা থেকে মাটির তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বহু বন্দী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে (দ্য নিউ ওয়ার্কার, ১ এপ্রিল ২০০৫)। প্রাক্তন পুতুল সরকারের প্রধান আলাউই-এর সাক্ষাৎকার নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় ৩ জন রুমানিয়া সাংবাদিক এবং তাঁদের ইরাকি-আমেরিকান দোভাষীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ হিসাবে দাবি তোলা হয়েছে যে, রুমানিয়ার যে ৮০০ জন সৈন্য এখন ইরাকের মাটিতে আছে তাদের অবিলম্বে দেশ ছাড়তে হবে (তথ্যসূত্র ঐ)। এ'সবই ইঙ্গিত করছে যে স্বাধীনতা আন্দোলন-কারীদের গোপন সংগঠন আজ আগের থেকেও অনেক বেশি সংগঠিত ও জোরদার। জনগণের মধ্যে তাদের প্রতি বিপুল সমর্থনের উপর নির্ভর করেই বিশাল মার্কিন সামরিক শক্তির সাথে তারা যুঝে চলেছে। মার্কিন সেনা ইরাক ছেড়ে পুরোপুরি চলে যাওয়ার আগে এবং ইরাকে প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ফিরে আসার আগে এই অবস্থার অবসান হওয়া অসম্ভব।

অব্যাহত নারী নির্যাতন বন্ধ ও নারীর সমান অধিকারের দাবিতে

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত

সারা দেশে অব্যাহত নারী নির্যাতন প্রতিরোধে, কর্মক্ষেত্রে সমমজুরী, সম্পত্তির উত্তরাধিকারসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠা, সিনেমা-সাহিত্যে, বিজ্ঞাপনে, নারীকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন, অশ্লীলতা-অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের উদ্যোগে মুক্তাঙ্গনে ২৩ মার্চ বেলা সাড়ে ৫টায় এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

মানববন্ধন পালনকালে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম ঢাকা নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক সামছুন্নাহার জ্যোৎস্না, সোমা সাহা, তাহেরা বেগম জলি, লাভলী তালুকদার, শাহজাদি আক্তার সাজু, আফসানা কলি প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বর্তমানে দেশে নৈরাজ্যকর অবস্থার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, লুটপাট, সন্ত্রাস, বোমা হামলা, সমাজের সকল ক্ষেত্রে অবর্ণনীয় নারী নির্যাতনের ফলে নারী অধিকার সবচেয়ে বেশি লংঘিত হচ্ছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। ফতোয়ার শিকার নূর বানু সহ অসংখ্য নারী নির্যাতনের ঘটনা উল্লেখ করে গার্মেন্টস কর্মী রাহেলা এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন ও অধিকার আদায়ের জন্য নারী-পুরুষসহ সমাজের বিবেক, বুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষকেই এই সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

নির্বাচন কমিশনের সুপারিশ

চারের পাতার পর

রাজনৈতিক আক্রমণ নামিয়ে আনা তো রীতিমতো একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেই সুদূর অতীতকাল থেকে নির্বাচন সম্পর্কে যে মোহজাল বিস্তার করা হয়ে আছে, মার্ক্স কীভাবে তার পর্দা ফাঁস করে দিয়েছেন, সেকথা উল্লেখ করে লেনিন বলেছেন, '*নিপীড়কশ্রেণীর কোন্ বিশেষ প্রতিনিধি পার্লামেন্টে* নিপীড়িতদের প্রতিনিধিত্ব করবে ও তাদের উপর পীড়ন চালাবে, কয়েক বছর অন্তর তা একবার স্থির করার সুযোগ নিপীড়িতদের দেওয়াটাই *হচ্ছে*, মার্ক্সের কথায়, *পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের মর্মার্থ*।' কি উন্নত, কি অনুন্নত সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই এই লক্ষ্যেই নির্বাচন হয়। আর এমন হয় বলেই নির্বাচনের পর বলতে শোনা যায়, 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ'। অথচ, ভারতের এই নির্বাচনী গণতন্ত্র সম্পর্কে দেশে ও বিদেশে কত না জয়ধ্বনি দেওয়া হয় ; বছর বছর নির্বাচন যায়, আর পণ্ডিতরা বলেন, ভারতের শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্র যে কত ব্যাপক ও সুদৃঢ়, তারই নাকি প্রকাশ ঘটছে নির্বাচনগুলির মধ্য দিয়ে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে নির্বাচনের এই মারপ্যাঁচ সম্পর্কে লেনিনের অসাধারণ মন্তব্যটি স্মরণীয়। তিনি দেখিয়েছেন, ''পুঁজিবাদে রাষ্ট্রীয় আধিপত্য কায়েম রাখার নানা রূপ আছে। কিন্তু সকল রূপের মধ্য দিয়েই পুঁজি তার ক্ষমতার প্রকাশ ঘটায়। ... বস্তুত, শাসনের বাইরের রূপটা যেখানে যত বেশি গণতান্ত্রিক সেখানে পুঁজিবাদী শাসন তত বেশি নগ্ন ও অমানবিক।''

কে না জানে যে, গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার নামেই ১৯৭৫ সালে এদেশে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় জরুরী অবস্থা জারি করে সমস্ত গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকারগুলি খর্ব করেছিলেন। ১৯৭২ সালে সর্বাত্মক নির্বাচনী কারচুপির মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছিল। এখন তো নির্বাচনে জালিয়াতি কারচুপি বহু রাজ্যেরই নির্বাচনী সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাদের অনিরসনীয় সংকট সামাল দিতে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে জনতার ওপর অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক পীড়নবৃদ্ধি করে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জনগণের ঘাড়ে চেপে বসে থাকতেই সংবিধান সংশোধন, কারচুপি, জরুরি অবস্থা জারি, বুথ দখল, ভোটার লিস্টে জালিয়াতি, গুণ্ডামি, এম এল এ, এম পি কেনাবেচার খেলা চলছে। কংগ্রেস-বিজেপির মত একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সংগঠনগুলি এভাবে সরকারি ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছে। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য একচেটিয়া ও আঞ্চলিক পুঁজিপতিদের দলগুলিতে ক্রিমিনালদের ভীড়। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে পেশাদার ক্রিমিনাল। সম্প্রতি ঝাড়খণ্ড, বিহার সহ বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনে রাজনৈতিক দল, পুলিশ-প্রশাসন ও সরকারগুলির ভূমিকা দেখলেই বোঝা যায়, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ নির্বাচন সংগঠিত করতে সম্পূর্ণ অপারগ। রাজনীতি-সরকার-প্রশাসন কত কলুষিত! কমিশন কার্যত ক্ষমতাসীনদের লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। এই রাজ্যেও সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলিও বিহার, ঝাড়খন্ড থেকে কোন অংশে অবাধ, ভয়মুক্ত নয়। টাকার খেলা, বুথ দখল, সন্ত্রাস সবই এখানে ঘটে কমিশনের পর্যবেক্ষকদের নাকের ডগায়। ঘটে সরাসরি পুলিশ-প্রশাসনের ও ক্ষমতাসীনদের প্রত্যক্ষ যোগসাজসে।

আসলে পুঁজিপতিদের স্বার্থে নির্লজ্জ দালালি করতে গিয়ে প্রতিদিন যে জনবিরোধী দানবীয় নীতিগুলি কার্যকর করা হচ্ছে, তার পরিণামে জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ জমা হচ্ছে। এই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধজনতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জনতার অনাস্থা সত্ত্বেও সরকারি ক্ষমতায় টিকে থাকতে পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষাকারী দলগুলিকে জবরদস্তির রাস্তা গ্রহণ করতেই হচ্ছে এবং হবে। নাহলে তারা ক্ষমতায় যাবে কী করে? পুঁজিবাদ এগুলিকে প্রশ্রয় দিতেও বাধ্য। কারণ, ভীতিপ্রদর্শন, সন্ত্রাস এবং জনবিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভে যদি দীর্ঘস্থায়ী শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনের রাস্তায় বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে পুঁজিবাদকে খতম করার দিকে চলে যায় — এই আশঙ্কাও তাদের আছে। তাই পুঁজিবাদকে রক্ষার জন্য দালাল নেতাদের, মন্ত্রীদের, ভাড়াটে পণ্ডিতদের তরফ থেকে নির্বাচন সম্পর্কে, গণতন্ত্র সম্পর্কে একটা মিথ্যা মোহ তৈরি করার তাগিদ থেকেই যায়। যেন এই গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। মনের মতো প্রতিনিধিরা ক্ষমতায় গেলেই হবে। আর এজন্য দরকার অবাধ নির্বাচন, ভয়মুক্ত নির্বাচন ; দুর্নীতিগ্রস্ত লোক, ক্রিমিনালরা যেন ভোটে দাঁড়াতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। এগুলি করলেই সাচ্চা নির্বাচন হবে। এইটা করার জন্যই দরকার হচ্ছে, সরকারের আগাম পদত্যাগ। দরকার হলে হাইকোর্টের ও সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের তত্ত্বাবধানে ভোট হবে। কমিশনের নতুন নতুন সুপারিশের দ্বারা এমন একটা আবহাওয়াই তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। বলা ভাল, বিচারপতিদের সম্পর্কে, বিচারব্যবস্থা সম্পর্কেও যত দিন যাচ্ছে, অস্বীকার করার উপায় নেই, যে জনতার মানসিকতার গভীরে অনাস্থা তৈরি হচ্ছে। বিচারব্যবস্থাও যে নিরপেক্ষ নয়, দুর্নীতিমুক্ত নয় — এ'রকম আশঙ্কাও জনমানসে গভীরভাবে দানা বাঁধছে। এমনকী বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার প্রয়াসের সামনে কোন আড়াল না রেখে এখন একেবারে নগ্নভাবেই গণআন্দোলন ভাঙবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে একথা আজ গোপন নেই। এহেন বিচারপতিদের তত্ত্বাবধানে স্বাধীন, সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ধারণা অলীক হতে বাধ্য।

বস্তুত, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের বক্তৃতার সাথে তার বাস্তব কাজের যে কোনও মিল নেই — গত লোকসভা নির্বাচনের আগে রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের ঘটনায় তা নগ্ন হয়ে গিয়েছে। লোকসভা ভোটের তারিখ ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর ও নির্বাচনী প্রচারকাজে মন্ত্রী ও আমলাদের আচরণবিধি চালু হয়ে যাওয়ার পর রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব বিহারে জনৈক ভোটারের হাতে নগদ টাকা তুলে দিচ্ছেন এই ছবি একটি টিভি চ্যানেলে দেখিয়ে দেয়। বহু চাপান-উতোরের পর নির্বাচন কমিশন বলে, নির্বাচনী আচরণবিধি ভাঙার দোষে লালুপ্রসাদ অপরাধী। কিন্তু ওটুকুই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লালুপ্রসাদকে এজন্য কোনও শাস্তি না দিয়ে তারা বলল যে, তিনি কথা দিয়েছেন এরপর থেকে তিনি নির্বাচনী আচরণবিধি সম্পূর্ণ মেনে চলবেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না। অর্থাৎ, মন্ত্রী হয়ে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে গুরুতর বাধা সৃষ্টির অপরাধ করেও তিনি পার পেয়ে গেলেন। অথচ লালুপ্রসাদের এমন কাজ এবারই প্রথম নয়।

২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বিধানসভার নির্বাচন উপলক্ষ্যে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী যখন একটি সরকারি হেলিকপ্টার ব্যবহার করেন এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং তা নির্বাচনী স্বার্থে ব্যবহার করেন, তখন নির্বাচন কমিশন তাঁদের দু'জনকেই নির্বাচনবিধি ভাঙার দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল। সেজন্য তাঁদের শুধু বলা হয়েছিল, হেলিকপ্টারের খরচ মিটিয়ে দিন, তাহলেই অপরাধ মকুব ! সেটাই ঘটেছিল, এভাবেই তাঁদের অপরাধকে নির্বাচন কমিশন আইনি স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই হচ্ছে ভারতের 'উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন', 'নিরপেক্ষ' ও 'গণতন্ত্রের পাহারাদার' নির্বাচন কমিশনের চেহারা ও চরিত্র। (সূত্র — দি স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ, ১৬-২-০৫)।

সুতরাং নির্বাচন কমিশনের সুপারিশগুলির কোনটাই সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। বাস্তবে প্রস্তাবগুলি জনসাধারণের চেতনার নিম্নমান ও বিভ্রান্তিকে কাজে লাগিয়ে, জনমানসের হতাশাকে কাজে লাগিয়ে প্রতারণার কৌশল ছাড়া কিছু নয়। পাশাপাশি জনতার বিক্ষোভগুলিও যাতে শ্রেণীসংগ্রাম ও পুঁজিবাদবিরোধী গণআন্দোলনের রাস্তায় প্রবাহিত হতে না পারে, তারও চাতুরীপূর্ণ ষড়যন্ত্র এটা। আসলে সীমিত অর্থেও স্বাধীন, অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের গ্যারান্টি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আজ বাস্তবায়িত করাটাও জনতার সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ওপরই নির্ভরশীল। এই সত্যকে ভোলা উচিত নয়।

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

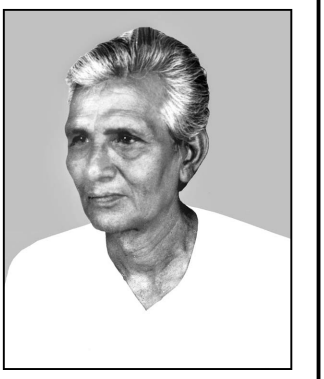

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার মেরীগঞ্জ অঞ্চলের প্রবীন পার্টি সদস্য কমরেড তরণী মণ্ডল গত ১৭ এপ্রিল জয়নগরে দক্ষিণাঞ্চল স্বাস্থ্যসদনে বার্ধক্যজনিত রোগে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনে এস ইউ সি আই-এর বক্তব্য ও ভূমিকার প্রতি তিনি প্রথমে আকৃষ্ট হন। সে সময় তিনি ছিলেন ঐ এলাকায় প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠেএবং সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনসংগ্রাম এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। দলের পত্র-পত্রিকা পড়া এবং বোঝার চেষ্টার মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আইকে গরিব মানুষের দল হিসাবে তিনি গ্রহণ করেন। তাঁর চরিত্রের গুণে তিনি সেসময় দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী এবং জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলানের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তিনি স্থানীয় এলাকায় গরিব চাষী-মজুরের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দলকে গড়ে তোলেন। তিনি দু'বার মেরীগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর্থিক, পারিবারিক, সামাজিক নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও অবিচলভাবে তিনি দলকে রক্ষা করার চেষ্টা করে গেছেন। কমরেড মণ্ডল তাঁর সামান্য জমি ও সঞ্চয় দলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকার গরিব মানুষ তাদের একজন সংগ্রামী যোদ্ধাকে এবং দল একজন মূল্যবান কমরেডকে হারাল।

কমরেড তরণী মণ্ডল লাল সেলাম

পাটবীজের কালোবাজারী, কৃষিতে বিদ্যুৎ মাশুলবৃদ্ধি ও ভ্যাটের বিরুদ্ধে

মুর্শিদাবাদে অবরোধ ও ডেপুটেশন

পাটবীজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও কালোবাজারী কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুতের মাশুল ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং ভ্যাট চালু করার প্রতিবাদে ১৮ এপ্রিল মুর্শিদাবাদের লালবাগ, রাণীনগর ও ইসলামপুরে বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। লালবাগে ও ইসলামপুরে রাস্তা অবরোধ হয় এবং স্থানীয় দোকানদার, বাজার করতে আসা চাষীরা এই অবরোধে পূর্ণ সমর্থন জানায়। ইসলামপুরে জনতার সমর্থন দেখে পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায়নি। কে কে এম এস-এর জেলা সম্পাদক কমরেড সাজেম আলির নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের দপ্তরে এক স্মারকলিপি পেশ করে। সর্বত্র দাবি তোলা হয় — সুলভে পাটবীজ সরবরাহ করতে হবে। অন্যান্য রাজ্যের মতই এ রাজ্যেও কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে এবং কৃষি উপকরণে উপযুক্ত পরিমাণে ভর্তুকি দিতে হবে। এছাড়া ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিও তোলা হয়। বহুজাতিক সংস্থার মুনাফা জোগাতে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে পাটবীজের আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির জন্য নেতৃবৃন্দ রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

ঝাড়খণ্ড

পাকুর জেলা শ্রমিক সম্মেলন

পাকুর কোয়ারি মজদুর ইউনিয়ন ও পাকুর ট্রাক-বাস শ্রমিক ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে ৩ এপ্রিল চেঙ্গাডাঙ্গা স্কুলে পাকুর জেলা শ্রমিক সম্মেলন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিনিধি সভায় বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের প্রধান অতিথি এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য রতন মুখার্জী। প্রকাশ্য সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড সমীর শেখ। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন জেলার বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড রফিকুল আমেদ। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা কমরেড সীতারাম টুডু বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড রফিকুল হাসান। বক্তারা শ্রমজীবী মানুষের উপর মালিক ও সরকারের ক্রমবর্ধমান আক্রমণের বিরুদ্ধে সঠিক নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

হলদিবাড়ীকে ময়নাগুড়ি-যোগীঘোপা রেলপথের সঙ্গে সংযুক্তির দাবি যুব কনভেনশনে

বেকারি, অপসংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ এবং কোচবিহার জেলার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হলদিবাড়ী ব্লককে ময়নাগুড়ি-যোগীঘোপা রেলপথের সঙ্গে যুক্ত করা, ভিন রাজ্যে কর্মরত যুবকদের পরিচয়পত্র ও জীবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে বেকারদের নাম নথিভুক্ত করা, রেশনকার্ড প্রদান করা সহ ১১ দফা দাবিতে ১১ এপ্রিল ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে হলদিবাড়ী ব্লক যুব কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে।

কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন মকবুল হোসেন সরকার। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেড খোকন চন্দ। রাজ্য সম্পাদক কমরেড স্বপন দেবনাথ তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জনজীবন তথা যুবজীবনের উপর যে সর্বাত্মক সংকট ও আক্রমণ নেমে এসেছে, তাকে মোকাবিলা করার জন্য উন্নত রুচি-সংস্কৃতির আধারে সঠিক নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য সহ সভানেত্রী কমরেড নাজমা খন্দকার। কমরেড জামাল প্রামাণিককে সম্পাদক করে ২১ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। কনভেনশনের শেষে একটি সুসজ্জিত মিছিল যুবজীবনের নানা দাবি সম্বলিত পোস্টার ব্যানার সহ হলদিবাড়ী শহর পরিক্রমা করে।

পাশ-ফেলসহ বৃত্তি পরীক্ষা চালু করতে হবে

একের পাতার পর

যা ফরমান জারি হবে মুখে বুজে শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবকদের তা মানতে হবে !

কীভাবে নেওয়া হচ্ছে এই পরীক্ষা? কোথাও হোম সেন্টার, আবার কোথাও অন্য স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা। কোথাও সেই স্কুলের শিক্ষকরাই নজরদার থাকছেন, পরীক্ষক হচ্ছেন; কোথাও অন্যরা। প্রশ্নপত্র কেমন হচ্ছে? দেখে বোঝার উপায় নেই — এটা ৪র্থ শ্রেণীর না দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা! প্রশ্নপত্রেই উত্তর দিতে হচ্ছে। প্রশ্নপত্র বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। কেন এই গোপনীয়তা? প্রশ্নের ধরন কেমন? বেশিরভাগ অবজেকটিভ টাইপ-এর প্রশ্ন। তাহলে টেক্সট বইগুলো এতদিন ধরে পড়ানো হল কেন? কোন উত্তর নেই। পরীক্ষার জন্য না আছে কোন অ্যাডমিট কার্ড, না দেওয়া হবে মার্কসীট বা সার্টিফিকেট। পাশাপাশি, জনগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে এবং এস ইউ সি আই কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ প্রতি বছর রাজ্যব্যাপী যে বৃত্তিপরীক্ষার ব্যবস্থা করে যাচ্ছে তা অত্যন্ত সুন্দর, সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে চলেছে। ১৩ বছর পেরিয়ে এবার চতুর্দশ বর্ষের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল। সরকারি নীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যে যেভাবে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা এক অনন্য দৃষ্টান্ত, এক নতুন ইতিহাস। যার তুলনা স্বাধীন ভারতে নেই বললেই চলে। এভাবে সরকারি সাহায্য ছাড়া বছরের পর বছর কোনও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে তা কল্পনা করাও কষ্টকর ছিল। অথচ এটা শুধু সুসম্পন্ন হচ্ছে তাই নয়, ক্রমাগত জনপ্রিয় হচ্ছে, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিপুল মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতায় তা ক্রমাগত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে চলেছে। ১৯৯১-১৯৯২ শিক্ষাবর্ষে ২০ হাজার পরীক্ষার্থী দিয়ে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে তা সওয়া তিন লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে শুরুতে ৬০ জনের সংখ্যা বর্তমানে ৫০০ জনে এসে পৌঁছেছে। এ পর্যন্ত প্রায় ২৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতায় এই পরীক্ষা আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে।

কী এমন যাদু যে এই পরীক্ষার সাথে নিজেদের যুক্ত করার জন্য মানুষ আগ্রহভরে ছুটে আসছে? বরং যেখানে দেখা যাচ্ছে সরকারি তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পর্কে মানুষের বিতৃষ্ণা ও হতাশার চিত্র; কোনও পরীক্ষার খাতা রাস্তায় পাওয়া যায়, কোন পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষক পাওয়া যায়না, কোনও পরীক্ষায় পরীক্ষকদের টাকা বৃদ্ধির আওয়াজ ওঠে, আবার কোন কোন পরীক্ষার ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে সময়ও নেই, নিয়মও নেই। বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পর্কে মানুষ যখন আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, তখন এই পরীক্ষার প্রতি এত প্রবল আগ্রহ কেন? কারণ এই পরীক্ষা সরকারি নীতিতে বীতশ্রদ্ধ অভিভাবকদের আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করার আন্দোলন রূপে আজ সর্বসাধারণের পরীক্ষায় পর্যবসিত হয়েছে। বিগত ২৪/২৫ বছরের অভিজ্ঞতায় মানুষ দেখেছে — সরকারি শিক্ষানীতি কত অসার। প্রতিকারের কোন রাস্তা না পেয়ে মানুষ যখন চরম হতাশাগ্রস্ত তখন এই বৃত্তি পরীক্ষার আহ্বান সর্বসাধারণের কাছে নূতন আলো বহন করে নিয়ে এল। মানুষ দেখল এটাই একমাত্র রাস্তা। শুধু আবেদন নিবেদন নয় — সরকার না মানলে বিকল্প পথের সন্ধান করে নিজেদেরই তা কার্যকর করতে হবে। এই আস্থাই তাদের চোখ খুলে দিয়েছে। সকলে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই পরীক্ষাকে সফল করার জন্য। সরকারি নীতির কল্যাণে যখন ইংরেজি বিদায় নিল, পাশ-ফেল প্রথা রদ করে সকলের জন্য অটোমেটিক প্রমোশন চালু হল — তখন দেখা গেল সরকারি স্কুলগুলিতে লেখাপড়ার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা না থাকায় ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের পড়ায়, পড়া তৈরিতে কোন উৎসাহ থাকছে না, অভিভাবকরাও বুঝতে পারছেন না, তাদের সন্তানরা কী শিখছে। সরকারি স্কুলগুলির এই হাল হলেও বেসরকারি স্কুলগুলিতে কিন্তু এক অবস্থা নয়। সেখানে ইংরেজি আছে, পাশ-ফেল বা পরীক্ষাও আছে। কিন্তু সেখানে লাগে অনেক টাকা। সরকারি স্কুলে বিনে পয়সায় পড়া যায়। তাই পয়সা ও বিনে পয়সার শিক্ষার ফারাক সরকারই করে দিল। দেখা গেল, যারা নীতির প্রবক্তা — তাদের ঘরের সন্তানরা প্রায় কেউই সরকারি স্কুলে পড়ছে না। সব যাচ্ছে বেসরকারি নামী ভাল স্কুলে। সন্তানদের পড়াবার মতো অর্থসংস্থান তাদের আছে। সাধারণ ঘরের সন্তানদের পয়সা না থাকায় সরকারি স্কুলে যেটুকু পড়া চলে — তাই শিখতে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে। জনদরদের কথা বলে, বামপন্থার কথা বলে, সরকার নিজেই দ্বৈতব্যবস্থা চালু করে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে চিরতরে নির্বাসনের ব্যবস্থা করছে। তারা নিজেদের সন্তানদের ভাল নামী স্কুলে পড়াচ্ছেন, বাড়িতে ভাল টিউটর রেখে পড়াচ্ছেন — একটুও বাধছে না। অথচ ভাষণ দেওয়ার সময় কত বড় বড় কথা ! এ কি বামপন্থা ?

দীর্ঘ ২৭/২৮ বছরের সি পি এম শাসনে এ'রাজ্যের শিক্ষার মান বর্তমানে তলানিতে এসে

এ বছর বৃত্তি পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করছেন অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে এবং পর্ষদ সম্পাদক কার্তিক সাহা

দাঁড়িয়েছে। একদা শিক্ষায় অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত এই পশ্চিমবাংলার শিক্ষাব্যবস্থা আজ ধুলায় লুণ্ঠিত। শিক্ষায় ক্রমাগত পিছোতে পিছোতে বর্তমানে তা অষ্টাদশ মানে নেমে এসেছে এবং এই মান ক্রমাগত নামছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সর্বত্র একই হাল। এ'রাজ্যের শিক্ষার মান বলে কিছু নেই বললেই চলে। অথচ বাস্তবকে অস্বীকার করে এরা মাঝে মাঝে আনন্দ পাঠ, ইংরাজি ট্রেনিং, বিজ্ঞান ট্রেনিং, ডিপিইপি ও সর্বশিক্ষা কর্মশালা — ইত্যাদি বিভিন্ন নামে শিক্ষকদের নিয়ে যে কাজগুলো করছে তাতে কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু আখেরে কোন উন্নতি হচ্ছেনা।

বর্তমানে এ'রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা কী? সংক্ষেপে বলতে গেলে যা দাঁড়ায় তা হল — দীর্ঘ ২৪ বছর যাবত এই রাজ্যে নূতন স্কুল স্থাপন সম্পূর্ণ বন্ধ। সরকারি ভাষ্যে ৫১ হাজার প্রাথমিক স্কুল বলা হলেও বাস্তবে ৪৮ হাজারের বেশি নয়। বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রকাশ — জনসংখ্যানুপাতে এই মুহূর্তে রাজ্যে আরও ১০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় দরকার, কিন্তু করা হচ্ছে না। শিক্ষকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার বলা হলেও বাস্তব তথ্য কোনদিনই প্রকাশ পায়নি। বর্তমানে ৪৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য। মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে রাজ্যে স্কুল চলছে প্রায় ১০ হাজার। ফলস্বরূপ শিক্ষকের অভাবে বহু স্কুল উঠে যাচ্ছে। স্কুল বাড়িগুলি বেশির ভাগেরই জীর্ণদশা। প্রায় ২০ হাজার স্কুলের বাড়ি হয় সম্পূর্ণ ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় অবস্থায় রয়েছে, সংস্কার বা পুনর্নির্মাণের কোন চেষ্টা নেই। সরকারি বই পাওয়ার চিত্র খুবই খারাপ। বিগত প্রায় ১৪/১৫ বছর যাবৎ দেখা যাচ্ছে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছাত্রছাত্রী বই পাচ্ছে না। বইয়ের মানও খুবই খারাপ। ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিলের নামে তিন কেজি চাল দেওয়া হত, তাও নিয়মিত নয় এবং বহুক্ষেত্রে পশুখাদ্যের অনুপযোগী, ওজনের কারচুপিও আছে। সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে রান্না করা খাবার দেওয়ার কথা বলা হলেও তা নিয়ে চলছে গড়িমসি। বরং এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে লেখাপড়ার পাটই চুকে যায়। শিক্ষোপকরণ দেওয়ার বালাই নেই। খেলাধূলার কোন পরিবেশ শহরাঞ্চলে নেই বললেই চলে। গ্রামাঞ্চলে থাকলেও খেলাধূলার সামগ্রী দেওয়া হয়না। এরকম একটা সংকটময় পরিস্থিতিতে যে প্রাথমিক শিক্ষা চলছে সেখানে শিক্ষার মান বাড়বে কোন যাদুবলে?

সংবিধানের নির্দেশ ছিল ১৯৬০ সালের মধ্যে ১৪ বছর পর্যন্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনের। কেন্দ্রীয় সরকার যেমন এদিকে ব্যর্থ, একইভাবে ব্যর্থ রাজ্য সরকারও। তারা শুধু কেন্দ্র দেখিয়েই খালাস। শিক্ষা বাঁচানোর নাম করে এরা আজ বিশ্বব্যাঙ্ক তথা সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহে মরিয়া। ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের ভূত যারা দেখছিল — টাকা নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের চোখে তার ছায়াও নেই। কেন্দ্রের সঙ্গে জোট বেঁধে এই সরকার ডিপিইপি-র নামে বিদেশি টাকা নিতে মরিয়া। আজ থেকে প্রায় ১০ বছর আগে ৫টি জেলার জন্য (মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম, কোচবিহার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা) এরা ৪০ কোটি করে টাকা নিয়েছে। এই টাকার অপচয় নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এরা মরিয়া। শুধু প্রচার করেছে প্রাথমিক শিক্ষার নাকি এতে বিরাট উন্নতি ঘটবে। কিন্তু বাস্তব বলছে — অন্যান্য জেলাগুলির মতই এই জেলাগুলিতেও প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র খুবই খারাপ, বরং বলা যেতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থা অনেক বেশি শোচনীয়। পরবর্তীকালে রাজ্যের আরও ৫টি জেলায় এই ডিপিইপি চালু করা হয়েছে। বর্তমানে মোট ১০টি জেলায় তা চলছে। বাকি জেলাগুলিতে এই টাকা নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই আজ কাঁদুনি গাইছে, (প্রাথমিক শিক্ষার জন্য) এত টাকা খরচ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের কাছে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষাকে এরা বিকিয়ে দিতে চাইছে। প্রাথমিক শিক্ষার কবর রচিত হচ্ছে।

বাংলা বন্ধসহ দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে সরকার অনুগামী পবিত্র সরকার কমিশন গত '৯৮ সালে ৪র্থ শ্রেণীতে Public Examination-এর কথা বললেও রাজ্য সরকার এতদিন ৪র্থ শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা বা প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা চালু করেনি। পক্ষান্তরে তারা চালু করেছে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্হিমূল্যায়ন। এটি চালু করার ক্ষেত্রে কোন্ কমিশন সুপারিশ করেছিল? কোনও কমিশনের সুপারিশ নয় — প্রস্তাব এল দলীয় শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে, এবং বলা বাহুল্য — তা স্বীকৃতও হল। অথচ কে-না জানে এই পরীক্ষাটির বাস্তব কোন ভিত্তিই নেই। তাছাড়া এটি পরীক্ষা না প্রহসন? বিস্তর অভিযোগ উঠেছে ভাল ফল করানোর জন্য মিথ্যা নম্বর দেওয়ার। নিজ স্কুলে বসে প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা — এর কী মূল্য? এই পরীক্ষার ভাল/খারাপ ফলের জন্য প্রমোশন বা ডিমোশনের কোন ব্যবস্থা নেই। নেই কোন পুরস্কার বা বৃত্তি। নিছক এই পরীক্ষাটি কেন, এবং এর পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় কেন — কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ তার সদুত্তর দিতে পারেননি। বর্তমানে ৪র্থ শ্রেণীতেও প্রায় একই ধাঁচে পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। এবার যে পরীক্ষা নেওয়া হল, সেখানে খাতা দেখা হচ্ছে পরীক্ষার পর পরীক্ষা কেন্দ্রেই। যাদের ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্ছে, সেই শিক্ষকরাই খাতা দেখছেন! এটা কি প্রহসন নয়?

পাশাপাশি জনগণ নির্ভর উন্নয়ন পর্ষদের বৃত্তি পরীক্ষার সবচেয়ে বড় সাফল্যের দিকটি হল — ৪র্থ শ্রেণী শেষে এই পরীক্ষার লক্ষ্য সামনে রেখে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়ার ও শিক্ষকদের মধ্যে পড়াবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। পরীক্ষার ফল ভাল করার জন্য ছাত্র অভিভাবকরা যেমন চেষ্টা করছেন, তেমনি শিক্ষক মশাইরাও যত্নশীল হয়ে প্রয়োজনের তাগিদে স্কুলের নির্ধারিত সময়ের পরেও ক্লাস নিচ্ছেন। এলাকার বহু শিক্ষিত ছাত্র-যুবকও বিনা পারিশ্রমিকে ফ্রি কোচিং ক্লাস করে ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করে দিচ্ছেন।

বহু শিক্ষক বিনা পারিশ্রমিকে বৃত্তি পরীক্ষার খাতা দেখছেন। শুধু দেখছেন বললে ভুল হবে — দ্রুত ফল প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনে অন্য কাজ ফেলে, রাত জেগে হলেও খাতা দেখে দিচ্ছেন। এঁরাই পরীক্ষার হলে গার্ড দিচ্ছেন এবং সরকারি বর্হিমূল্যায়নের মত দায়সারা কাজ নয়, যথার্থ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন। সব মিলিয়ে এই বৃত্তিপরীক্ষা লেখাপড়ার পরিবেশ কিছুটা ফেরাতে সাহায্য করেছে। এই বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনার সঙ্গে রাজ্যের সর্বত্র বহু সাধারণ মানুষ, যুবক-যুবতীরা যুক্ত, যাঁরা পরীক্ষার আগে ও পরীক্ষার সময় স্বেচ্ছাশ্রম দেন। এও এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

প্রতি বছর কৃতি ছাত্রছাত্রীদের কয়েক লক্ষ টাকার বৃত্তি প্রদান করা হয়। ফল প্রকাশের একমাসের মধ্যে বিশাল অনুষ্ঠানে কৃতীদের হাতে বৃত্তির অর্থ ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। এত বিপুল পরিমাণ টাকা আসে কোথা থেকে? কারা দেন সেই টাকা? কোন ব্যবসায়ী মহল, কোটিপতিরা কিংবা বিদেশী টাকা নয়। যা আজ ভাবা দুষ্কর, সেই পথেই এই বিপুল অর্থ প্রতি বছর সংগৃহীত হয়। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে উপস্থিত হাজার হাজার অভিভাবকবৃন্দ ২, ৫, ১০ টাকা — যে যার সাধ্যমত এই তহবিলে দান করেন। এছাড়া বৃত্তি তহবিলে ৬০০/১২০০ টাকার স্মারকবৃত্তি দান করেন কয়েকশত মানুষ। কোন প্রিয়জনের স্মৃতিতে তাদের এই মহৎ দান। এভাবেই তিল তিল করে গড়ে তোলা তহবিল থেকেই প্রতি বছর ৬০০/১২০০ টাকা হিসেবে রাজ্য ও জেলা বৃত্তি দেওয়া হয় ৫০০ জন ছাত্রছাত্রীকে — যার অর্থমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। এত বিপুল সংখ্যক মানুষের দানে এতবড় কর্মকাণ্ড ধারাবাহিকভাবে পরিচালনার নজির খুঁজে মেলা ভার।

এই বৃত্তি পরীক্ষা আজ দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করেছে। এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে বহু মানুষ সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার ফলেই এতবড় কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করা যাচ্ছে।

আজ যদি সরকারকে সত্যিই শিক্ষক-অভিভাবকদের আস্থা অর্জন করতে হয় তাহলে বহির্মূল্যায়নের নামে পাশ-ফেলহীন পরীক্ষার ব্যবস্থা করলে চলবে না। আন্দোলনের কাছে তাদের আংশিক নতি স্বীকার করতেই হয়েছে। আশা করব, প্রাথমিক শিক্ষার আরও ক্ষতি না করে তারা অবিলম্বে পাশ-ফেল সহ বৃত্তি পরীক্ষা চালু করবে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

২২ এপ্রিল মহান লেনিনের ১৩৫তম জন্মদিবসে রাশিয়ার রেড স্কোয়ারে লেনিন মুসোলিয়ামের সামনে লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হাজার হাজার মানুষের মিছিল

মহার্ঘভাতা দয়ার দান নয়, তা ন্যায্য অধিকার

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বিক্ষোভ

গত ২০ এপ্রিল ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)-এর আহ্বানে রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে মির্জাগালিব স্ট্রীটের খাদ্যভবন ও অন্যান্য অফিস চত্বরে পাঁচ শতাধিক কর্মচারীর এক সুসজ্জিত মিছিল পরিক্রমা করে। রি-ডিপ্লয়মেন্ট বাতিল, বেতন সংশোধন, ৫০ শতাংশ মহার্ঘভাতাকে মূল বেতন রূপে গণ্য করা সহ অন্যান্য দাবিতে এবং এপ্রিল মাসের বেতনের সাথে ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানিয়ে যখন মিছিল শুরু হওয়ার মুখে তখনই রাজ্য কো অর্ডিনেশন ভুক্ত কিছু কর্মচারী ঝাঁপিয়ে পড়ে মিছিলকে বানচাল করার জন্য। 'তাদের মিটিং-এর অসুবিধা হচ্ছে' এই অজুহাতে তারা মিছিলের কর্মচারীদের সাথে হাতাহাতি শুরু করে দেয়। পরে মিছিলের কর্মীদের প্রতিরোধে তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। মহাকরণ, নব মহাকরণ, বিকাশ ভবন, সরকারি প্রেস, বিক্রয়কর ভবন, পর্যটন বিভাগ, আই ডি হাসপাতাল সহ কলকাতার বিভিন্ন অফিস থেকে কর্মচারীরা এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। খাদ্যভবনের সাধারণ কর্মচারীরা এই প্রতিবাদী মিছিল দেখতে থাকেন এবং অভিনন্দন জানান। মিছিলের পরে জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আগামী ২ থেকে ৬ মে আর্থিক বঞ্চনার প্রতিবাদে এপ্রিল মাসের বর্ধিত মহার্ঘভাতা প্রত্যাখ্যান করে তা মানি অর্ডারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে ফেরৎ দেওয়ার জন্য কর্মচারীদের কাছে আহ্বান জানানো হয়।

এই সিদ্ধান্ত অমানবিক এবং কর্মচারীদের পক্ষে অমর্যাদাকর

— প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২১ এপ্রিল নিম্নলিখিত বিবৃতিতে বলেছেন,

"আমরা গভীর ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ও করবৃদ্ধির ফলে সরকারি কর্মচারী তথা জনজীবনে গভীর সংকট নেমে এসেছে। যদিও একথা সকলেই জানেন যে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা সবচেয়ে কম মহার্ঘ ভাতা পান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ১৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা পাওনা থাকা সত্ত্বেও ১ এপ্রিল থেকে সরকার মাত্র ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

"আমরা মনে করি, এই সিদ্ধান্ত অমানবিক এবং কর্মচারীদের পক্ষে অমর্যাদাকর।

"সরকারি এই ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ওয়েস্টবেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়) এই বর্ধিত মহার্ঘভাতা ফেরৎ দেওয়ার যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে আমরা তাকে সর্বতোভাবে সমর্থন করছি এবং সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এই কর্মসূচি সফল করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিতে আহ্বান জানাচ্ছি।"

ভ্যাটের বোঝা ঃ চাপে পড়ে সরকার জনদরদীর মুখোশ পরছে

ভ্যাটের ফলে কোন্ কোন্ জিনিসের দাম বাড়ছে তার তালিকা ২২ এপ্রিল আনন্দবাজার প্রকাশ করার পরদিনই ২৩ এপ্রিল গণশক্তি তালিকা ছেপে দেখিয়েছে কোন কোন জিনিসের দাম কমছে। কিন্তু বাজারে দেখা যাচ্ছে দাম কমেনি কিছুরই। কেন? তার জবাবে অনিল বিশ্বাস বলেছেন, অনেকের কাছে পুরানো স্টক আছে, তাই দামের সুফল পেতে মাস খানেক সময় লাগবে। "ভ্যাট চালুর ফলে সাধারণ মানুষের কেন সুবিধা হবে তার ব্যাখ্যা দিয়ে অনিল বিশ্বাস বলেছেন, এর ফলে নিত্যব্যবহার্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যগুলির ক্ষেত্রে হয় কর একদমই থাকবে না, না হলে করের হার কমবে, বাড়বে না। যেমন, চাল ডাল আট ময়দা সুজি সহ সমস্তরকম খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে ভ্যাটের ফলে কোন কর থাকছেই না। সমস্ত রকম কাঁচা সবজি - আনাজ, মাছ, মাংস কর শূন্য থাকছে। নুন, চিনি, সমস্ত ধরনের মিষ্টি ও নোন্তা খাবার করমুক্ত হচ্ছে। পাঁউরুটি এবং খেতে ফসল বোনার জন্য শস্যবীজে ভ্যাট বসছে না" (গণশক্তি ২২-৪-০৫)।

সত্যিই কি তাই? উত্তর একই সঙ্গে হ্যাঁ এবং না। উপরোক্ত পণ্যগুলির উপর এখন ভ্যাট নেই — এটা সত্য। কিন্তু দু-চার দিনে আগেও ছিল — এটাও সত্য। উপরের বস্তুগুলি ছাড়াও মুড়ি, মুড়কি, খৈ, চিঁড়ার ওপরও দু-চার দিন আগেও ভ্যাট ছিল। চাপের মুখে ছাড়ের তালিকা সংশোধন করে ১লা এপ্রিল প্রদত্ত নতুন তালিকায় রাজ্য সরকার এগুলিকে আপাতত কর মুক্ত করেছে। ২১ এপ্রিল অর্থমন্ত্রী বলেছেন, জীবনদায়ী ওষুধকে তাঁরা ছাড়ের তালিকায় আনবেন। ১লা এপ্রিলের সংশোধিত তালিকায় জীবনদায়ী ওষুধ ছাড়ের আওতায় নেই। কাজেই, যদি সত্যিই জীবনদায়ী ওষুধকে ভ্যাটের আওতার বাইরে রাখতে হয় তবে তালিকা আবার সংশোধন করতে হবে। আবার সিপিএম নেতা যখন জানাচ্ছেন, জীবনদায়ী ওষুধকে ছাড় দেওয়া হয়েছে, তখন রাজ্যের বিক্রয় কর কমিশনার বলছেন, "জীবনদায়ী ওষুধ, পেসমেকারসহ কিছু জিনিসের দাম বাড়বে, একথা ঠিক।" (বর্তমান ২৩-৪-০৫) রাজ্যের ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা ভ্যাটের ফলে ট্যাক্স ইন্সপেক্টরদের দৌরাত্ম্য বাড়বে। তাঁদের আশ্বাস দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, এই আশঙ্কা অমূলক। কারণ, বাণিজ্য কর কমিশনারের লিখিত অনুমতি ছাড়া কোন ইন্সপেক্টর দোকানে হানা দিতে পারবেন না। বাণিজ্য কর কমিশনারের কাছে সাংবাদিকরা জানতে চান — আইনে এটা বলা আছে কিনা। উত্তরে বাণিজ্য কর কমিশনার সি এম বাচওয়াত বলেন — "না, আইনে এরকম নেই। তবে অর্থমন্ত্রী যদি বলে থাকেন, তবে ভবিষ্যতে নিশ্চয় আইনের মধ্যে চলে আসতে পারে" (বর্তমান ২২-৪-০৫)। অর্থাৎ আবার সংশোধন। ইতিমধ্যেই বাণিজ্য কর দপ্তর ২১শে মার্চ 'ভ্যাট অ্যাট এ গ্ল্যান্স' (ভ্যাট ঃ এক নজরে) পুস্তিকা প্রকাশ করে ২৪শে মার্চ তা সংশোধন করে আবার নতুন 'ভ্যাট অ্যাট এ গ্ল্যান্স' পুস্তিকা প্রকাশ করেছে।

এস ইউ সি আই হল একমাত্র রাজনৈতিক দল যে, গোড়া থেকেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভ্যাটের বিরোধিতা করছে। টেকনিক্যাল খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়েও আমরা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছি, ভ্যাটের লক্ষ্য হল বৃহৎ মালিকগোষ্ঠীকে কর ছাড় দেওয়া, খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের পথ সহজতর করা এবং করের জাল আরও বিস্তৃত করে জনগণের পকেট কেটে সরকারের আয় বাড়ানো। করের জাল আরও বিস্তৃত করা মানেই জিনিসপত্রের দাম বাড়া। ভ্যাট চালু করতে গিয়ে সিপিএম পড়েছে প্রবল বাধার সামনে। দেশ জুড়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের লাগাতার প্রতিবাদ ও পাইকারি বাজার বন্ধ হয়েছে। কার্যত ভ্যাট নিয়ে একটা অরাজক অবস্থা দাঁড়িয়েছে। সরকারি তরফে মিথ্যা ও অর্ধসত্যের প্রচার অবস্থা আরও জটিল করে তুলছে।

বাধার মুখে পড়ে সিপিএম এখন যেকোন মূল্যে ভ্যাট চালু করার জন্য কিছু পণ্যকে ছাড়ের আওতায় এনে মানুষকে বোঝাতে চাইছে যেহেতু এগুলিকে তারা ছাড়ের আওতায় রেখেছে, তাই ভ্যাটে জনগণের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। প্রশ্ন হল, তাহলে — ২০০৩ সালে যখন ছাড়ের তালিকাটি তারা তৈরি করেছিল তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় এই দ্রব্যগুলিকে তারা করের আওতায় রেখেছিল কেন? ভুল হওয়ার কোন সুযোগ এক্ষেত্রে নেই, কারণ বিক্রয় করের ছাড়ের ১০০টি পণ্যের পুরানো তালিকাটি তাদের হাতেই ছিল। অর্থাৎ জেনেশুনেই করের জালকে আরও ছড়াতে, নতুন নতুন জরুরি ব্যবহার্য দ্রব্যকে করের আওতায় এনে জনগণের পকেট কেটে সরকারের আয় বাড়ানোই তাদের মূল লক্ষ্য, যা থেকে তারা সরেনি। তাই সংশোধিত তালিকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় যেসব দ্রব্যকে এখন তারা চাপে পড়ে ছাড়ের আওতায় এনেছে, সেগুলি তালিকায় না থাকলেও সরকারের মাথায় আছে এবং থাকবে। কোনভাবে আপাতত কিছু ছাড় দিয়ে ভুল বুঝিয়ে যদি তারা ভ্যাটকে মানিয়ে নিতে পারে, তাহলে আগামী দিনে আবার তালিকা সংশোধন করা হবে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে কর চালু হবে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই সরকারের প্রতারণামূলক চরিত্র ইতিপূর্বে বহুবার প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং ভ্যাটের বিরুদ্ধে জনগণকে দাঁড়াতেই হবে।

বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি, বন্ধ কৃষিকাজ, বিক্ষোভে চাষীরা

কৃষি-সেচে বিদ্যুতের দাম মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ফি বছর বন্যা কবলিত উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার প্রান্তিক চাষীদের মাথায় হাত পড়েছে। অধিকাংশ চাষীর বেশি মূল্য দিয়ে বিদ্যুৎ কিনে অগভীর নলকূপের সাহায্যে জমিতে সেচের জল দেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় গাইঘাটার হাজার হাজার বিঘা জমি পতিত হয়ে পড়েছে। কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গাইঘাটা ব্লকের ক্ষুদ্র চাষীরা পেটের তাগিদে অন্য পেশায় নিযুক্ত হতে চাইছেন। বেশিরভাগ কৃষক কোনও কাজের সন্ধান করতে না পেরে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির গাইঘাটা শাখার সম্পাদক স্বপন গোস্বামী এক পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, "গত বছর কৃষিসেচে বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য অনুসারে, চাষীদের উপর একটি বিদ্যুৎচালিত অগভীর নলকূপের জন্য বছরে ৫ হাজার ৫৪০ টাকা ধার্য করা হয়।" বিদ্যুৎচালিত অগভীর নলকূপ কৃষক সমিতির সভাপতি দেবদাস বৈদ্য বলেন, "গতবার বিদ্যুতের দাম বাড়ার সময় গাইঘাটা ব্লকে ৬০০ কৃষক অগভীর নলকূপের লাইন কেটে দেয়। এবার যে পরিমাণ দাম বেড়েছে, তাতে গাইঘাটার সমস্ত কৃষকই বিদ্যুৎচালিত অগভীর নলকূপের লাইন কেটে দেবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।" গাইঘাটা ব্লকের ফুলসরা পঞ্চায়েতের বৈকারা গ্রামের কৃষক কমলা ঘোষ বলেন, "আমার ছয় বিঘে জমি আছে। বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাওয়ায় আমি অগভীর নলকূপের লাইন কেটে দিয়েছি।" সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সম্পাদক অনুকূল ভদ্র বলেন, "দু'বছর আগেও জেলাতে বিদ্যুৎচালিত অগভীর নলকূপের ৫০ হাজার গ্রাহক ছিলেন। ইতিমধ্যেই ৫০ শতাংশ কৃষক তাঁদের জমিতে অগভীর নলকূপের লাইন কেটে দিয়েছেন। ১ এপ্রিল থেকে যে বর্ধিত মূল্য চালু হয়েছে, তাতে প্রচুর গ্রাহক অগভীর নলকূপের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। এভাবে চললে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে যাবে। খাদ্যের সঙ্কট দেখা দেবে।" অনুকূলবাবু বলেন, "যে সমস্ত কৃষকের বিদ্যুৎচালিত অগভীর নলকূপের লাইন আছে, তাঁদেরকে আমরা মিটার দেওয়ার জন্য বিদ্যুৎ দফতরের কাছে আবেদন জানিয়েছি। মিটার দেওয়া হলে কৃষকরা বুঝতে পারবেন, তাঁরা কতটুকু বিদ্যুৎ খরচ করেছেন। ফলে ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিল বহন করতে হবে না কৃষকদের।" কৃষিসেচে বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার ও মিটারের দাবিতে ১৯ এপ্রিল গাইঘাটা বিদ্যুৎ দফতরে কৃষকরা বিক্ষোভ দেখান, বিদ্যুৎ দফতরের স্টেশন ম্যানেজারকে একটি স্মারকলিপিও দেন। এ প্রসঙ্গে গাইঘাটা বিদ্যুৎ দফতরের স্টেশন ম্যানেজার মলয়রঞ্জন পাল বলেন, "কৃষকরা আমার কাছে যে সমস্ত দাবি জানিয়েছেন, সেগুলি আমি দফতরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।"

(উত্তরপ্রান্ত, সংবাদ প্রতিদিন ২০-৪-০৫)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in